স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
৩০ মে, ২০১১, ১৫ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা

আমেরিকার ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান

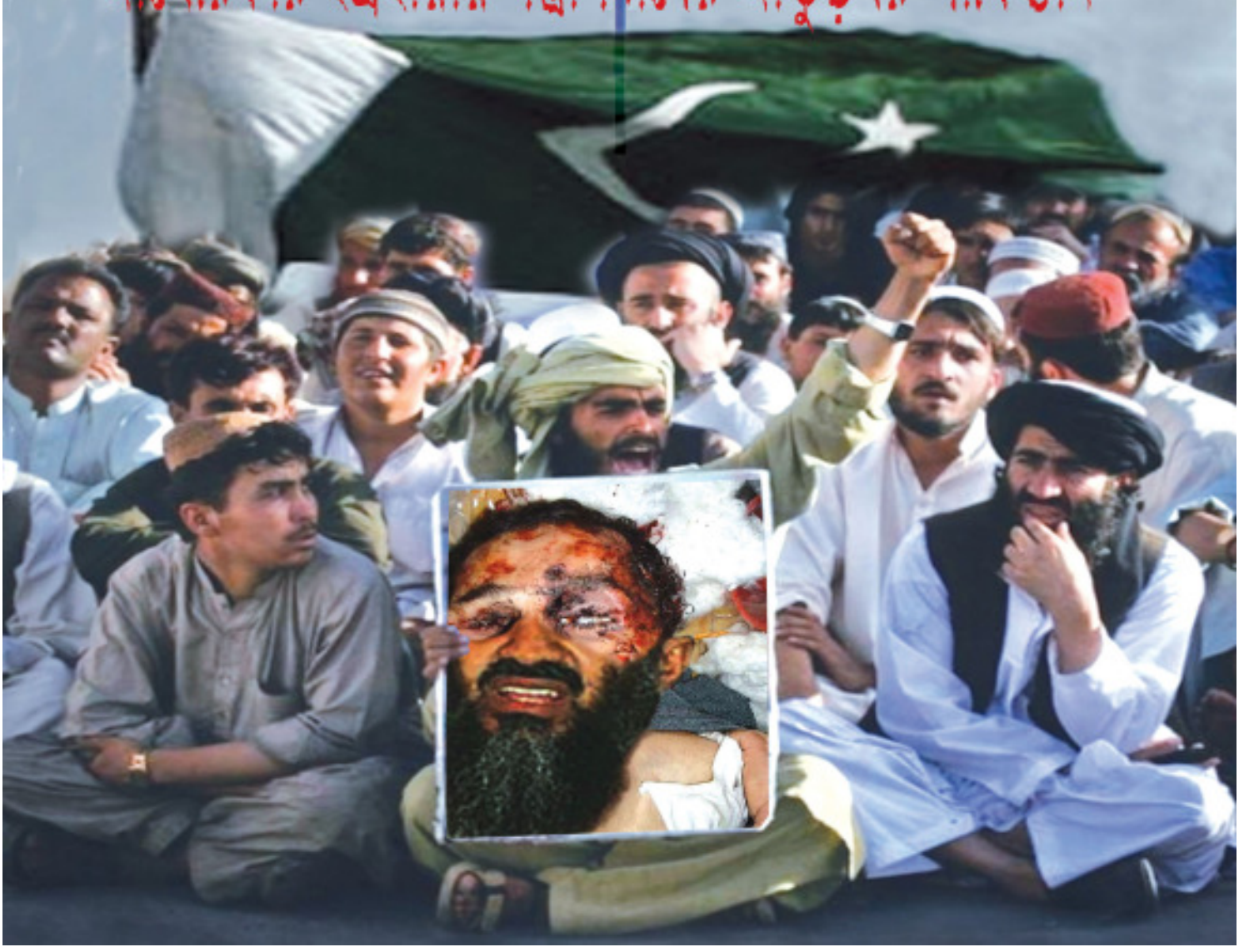

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

দুর্নীতি, ব্যর্থতা আর অপদার্থতায় ভরা দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের রিপোর্ট-কার্ড ❑ ৮

স্লোগান উঠেছে — 'গ্যাং অফ ফোর হটাও, সিপিএম বাঁচাও' ❑ ৯

রাজ্যের আগামী ভবিষ্যৎ কার হাতে? ❑ শ্যামল কুমার হাতি ❑ ১১

পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ❑ অরিন্দম চৌধুরী ❑ ১৩

আমেরিকা, ওসামা বিন লাদেন এবং পাকিস্তান ❑ বাসুদেব পাল ❑ ১৪

এপারের সন্ত্রাস ওপারের আঁতুড়ে ❑ অর্ণব নাগ ❑ ১৬

জেলার খবর— ❑ ১৯

সিপিএমের ঢাকী বিমান বসু সন্ত্রস্ত কেন 'মিডিয়া সন্ত্রাসে'? ❑ রমাপ্রসাদ দত্ত ❑ ২০

ঘাতক কীটনাশকের উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে কেরলে ❑ ২১

ঐতিহাসিক দুর্গ কালীঞ্জর ❑ সোমশুভ্র চক্রবর্তী ❑ ২৪

পর্যটকের চোখে পণ্ডিচেরী ❑ তরুণ কুমার পণ্ডিত ❑ ২৫

ভারতীয় রাজনীতিতে উজ্জ্বল মনীষা বিনায়ক দামোদর সাভারকর ❑ শ্যামলেশ দাস ❑ ২৮

বহু জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব আওড়ে দেশভাগের ওকালতি ❑ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী ❑ ২৯

শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়া ❑ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ❑ ৩০

নিয়মিত বিভাগ

এই সময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **ভাবনা-চিন্তা : ২৩** ❑ **নবাঙ্কুর : ২৭** ❑ **রঙ্গম : ৩১** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সন্ত্রাসবাদ — ১৪–১৬

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৩০ মে - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

সিপিএমের অস্ত্রাগার

বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য অভিযান চলিতেছে। প্রত্যহ অস্ত্র উদ্ধার হইতেছে বিভিন্ন স্থান হইতে। পশ্চিমবঙ্গ কি তবে এতদিন যুদ্ধক্ষেত্র ছিল? ১৩ মে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কার্যত মুক্তি পাইয়াছেন। পরিবর্তন না আসিলে পশ্চিমবঙ্গের কত মানুষ যে ওইদিন খুন হইতেন, কত মহিলা যে ধর্ষিতা হইতেন, কত গৃহ যে লুণ্ঠিত হইত তাহা ভাবিয়াও শিহরিত হইতে হয়। কার্যত সিপিএম দলের কার্যালয়গুলি হইতে অস্ত্র উদ্ধার হইতেছে দেখিয়া আজ মনে হইতেছে ভগবান বাঙালিকে রক্ষা করিয়াছেন। সিপিএম দলের হাত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যাইবার পর রাজ্যের পুলিশ বাহিনী তৎপর হইয়া এখন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সিপিএম দলের অস্ত্রাগার অভিযানে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই রাজ্যের পুলিশ এই অস্ত্রাগারের হদিশ জানিত। কিন্তু পুলিশের বৃহৎ অংশ সিপিএম সরকারের ভয়ে মুখ খুলিত না এবং পুলিশের অন্য অংশ যাহারা সিপিএম দলের কমরেড হিসাবেই পরিচিত তাহাদের প্রত্যক্ষ মদতেই গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক অস্ত্রাগার। যেহেতু এখন সিপিএম ক্ষমতায় নাই তাই ওপর মহলের চাপে সিপিএম দলের অস্ত্রাগার উন্মোচিত হইতেছে। সিপিএম দলের দলীয় কার্যালয়ে এবং দলের নেতা-কর্মীদের বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে মিলিতেছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। বাঁকুড়ার জয়পুর, কোতলপুর, ইন্দাস, হুগলির গোঘাট, খানাকুল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর গড়বেতা চন্দ্রকোণা এমন কী বর্ধমানের লালদুর্গগুলিতে মিলিতেছে এই অস্ত্র। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক উদ্ধার হইয়াছে বর্ধমানের ৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়ায় সিপিএমের নির্বাচনী কার্যালয় হইতে। বিভিন্ন জেলায় এই অস্ত্র উদ্ধার মামলায় এখন পর্যন্ত পুলিশ যাহাদের গ্রেফতার করিয়াছে তাহার প্রায় সকলেই সিপিএম দলের জোনাল ও লোকাল কমিটি পর্যায়ের নেতা। এত অস্ত্র সিপিএম দল একদিনে সংগ্রহ করে নাই। নেতাই কাণ্ডের পর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের আহ্বানে দিল্লি যাইয়া রাজ্যে বেআইনী অস্ত্র মজুতের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন নির্বাচনের পূর্বে সেই সব অস্ত্র উদ্ধার করিবে তাহার পুলিশ। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি না রাখিয়া বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার সেই অস্ত্র মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইচ্ছা কোনওরকমে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গঠন হইলেই রাজ্য হইতে বিরোধীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করিতে সেই অস্ত্র ব্যবহার করিবেন বলিয়া। খুনি হিংসায় বিশ্বাসী দল বলিয়া দেশ হইতে যদি মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করা হইয়া থাকে তবে একই কারণে সিপিএম দলকে পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করা হইবে না কেন? তাহাদের চৌত্রিশ বছরের রাজত্বকালে মরিচঝাঁপি হইতে নেতাই পর্যন্ত তাহারও তো কম লোককে হত্যা করে নাই। দলীয় কার্যালয়গুলি হইতে যে হারে অস্ত্র উদ্ধার হইতেছে তাহাতে মাওবাদীদের থেকেও সিপিএমকে কম হিংসাশ্রয়ী দল বলিয়া মনে হইতেছে কি?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের স্থাপয়িতাগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন, তাহা এখানেই সঞ্চিত রহিয়াছে। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন—ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মুসলিম ভোটের মেরুকরণে অশনি-সংকেত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সদ্য-সমাপ্ত অসম ও কেরল বিধানসভায় রাজনৈতিক দলগুলোর তোষণনীতির ফলে মুসলিম ভোটের মেরুকরণ নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। তারা এর মধ্যে অশনি সংকেত লক্ষ্য করছেন। অসমে কট্টরপন্থী বদরুদ্দিন আজমলের এ ইউ ডি এফ এবং কেরলে মুসলিম লীগের পক্ষে মুসলিম ভোট মেরুকরণের জন্য যথাক্রমে অসম ও কেরল বিধানসভায় ওই দুটি দল নির্ণায়কের ভূমিকায় পৌঁছে যেতে পেরেছে। এমনকী এ ইউ ডি এফ অসম বিধানসভায় প্রধান বিরোধীর আসনে বসাকেই পাখির চোখ করেছে। সাচার কমিটির অন্যতম সদস্য আবুসাল্লাহ্ শরীফ, মূলত যার সুপারিশের জেরেই মুসলিমদের দলিতদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তিনি মুসলিমদের এই ভোট-প্রবণতাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য মুসলিম সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র ধর্মীয় গন্ডীর (অর্থাৎ মুসলিম লীগ কিংবা বদরুদ্দিন আজমলের দলে) মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, সব রাজনৈতিক দলেই জড়িয়ে পড়তে হবে। আবুসাল্লাহ্ শরীফের এই বক্তব্যে নয়াদিল্লীর কূটনৈতিক মহল মনে করছে, প্রকাশ্যে অন্তত সাম্প্রদায়িক তকমাটা ঝেড়ে ফেলে ভোট- ব্যাঙ্কের তাগিদে রাজনীতি করা রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোট দিয়ে সেই দলগুলোকে মুসলিমদের তাঁবে রাখতেই সাচার কমিটির সদস্যের এহেন মন্তব্য। প্রসঙ্গত, রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় ঘোষণাটিতেই সাচার কমিটির রিপোর্টকে কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছেন। বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এই কারণেই যে মুসলিম জনসংখ্যার আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্যেই ভোটের মেরুকরণ চলছে। এমনিতে অসমে ৩০ শতাংশ ও কেরলে ২৫ শতাংশ মুসলিম রয়েছে সরকারী তথ্যানুযায়ী। কিন্তু অসম জুড়ে অনুপ্রবেশের ফলে এবং কেরলে কিছুটা হলেও 'লাভ জেহাদে'র জন্য ওই দুটি রাজ্যে সরকারি তথ্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি মুসলমানের বাস বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তাই আশঙ্কটা এখানেই যে, এদেশের নাগরিক নন কিন্তু ভোট-বাক্স ও কয়েকটি মুসলিম-জনগোষ্ঠী পরিচালিত হচ্ছে এইসব বিদেশীদের দ্বারাই।

দেশের স্বার্থে 'রিলিজিয়ন'-কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব জনগণনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গণতন্ত্রে 'নাম্বার' বা সংখ্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই জনসংখ্যার বিন্যাস বা জনভারসাম্যের বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত। তাই জনগণনার সময় 'রিলিজিয়ন'-এর বিষয়টি যতটা বিশদে করা দরকার ততটাই করতে হবে। গত ৭ মে সন্ধ্যায় কলকাতায়

ডাঃ সুজিত ধর ফাউণ্ডেশনের আলোচনা সভা

বাংলা একাডেমিতে 'দেশের স্বার্থে জনগণনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন বিবিসি-র সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক। ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন ছিল এই আলোচনাসভার উদ্যোক্তা।

সভার সূত্রপাত করে বিশিষ্ট সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র বলেন, জাতীয় স্বার্থে জনগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও ভোটের স্বার্থে কোনও রাজনৈতিক দলই বিষয়টি নিয়ে কিছু বলছে না। যদিও ২৬/১১-তে মুম্বাই বিস্ফোরণ কাণ্ডের জেলবন্দী আসামী কাসভ-এরও নাম জনগণনার তালিকায় উঠে গেছে। বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে ঢুকে এদেশে অনেক পাকিস্তানীই ভারতের জনারণ্যে মিশে গেছে। জনগণনার রিপোর্টে তাদের কোনও হদিশ মিলছে না। কিন্তু এসব নিয়ে সব দলই উদাসীন। অথচ এরই ভিত্তিতে শ্রী নন্দন নিলেকানি তৈরি করতে চলেছেন ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ড।

সভার অন্যতম বক্তা বিহার সরকারের প্রাক্তন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অমিতাভ ঘোষ বলেন, ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকর বলেছেন, ভারত অবিভাজ্য। এরপরও যদি ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করতে হয় তবে অবশ্যই লোকবিনিময় করতে হবে। দেশভাগ হলেও লোকবিনিময় এখনও হয়নি। এই কাজটাই এখন করতে হবে বলে শ্রী ঘোষ সকলকে আহ্বান জানান।

সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান অরুণ ভট্টাচার্য।

দলের অবস্থা খতিয়ে দেখতে কলকাতায় আসছেন গড়করি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মোট প্রদত্ত ভোটের ৪ শতাংশ পেয়েছে যা ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট কেন্দ্রে মনোজ টিগ্গা। এই কেন্দ্রে বিজেপি পেয়েছে ৩৪৬৩০টি ভোট। এছাড়া মালদা জেলার হবিবপুরে ৩১৬৩৮ এবং বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে ৩১০৩৩টি ভোট পেয়েছে। বিশ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছে ফরাক্কা—২৬,৬৯৬, উলুবেড়িয়া পূর্ব—২১,৫৩০ ও বৈষ্ণবনগর—২০, ৪৮৩। পনেরো হাজারের বেশি ভোট পেয়েছে ধূপগুড়ি, রামপুরহাট, সন্দেশখালি, বেলডাঙ্গা, পূর্বস্থলী উত্তর, তুফানগঞ্জ, জোড়াসাঁকো, হাওড়া উত্তর। ১০,০০০-এর বেশি ভোট পেয়েছে ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে।

সরাসরি 'পোলারাইজেশন' এবং পরিবর্তনের হাওয়াতেও বিজেপি অন্তত ৩৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের সংগঠনকে অটুট রাখতে পেরেছে। বিজেপির সাংগঠনিক বিচার-বিশ্লেষণে এইসব তথ্য উঠে এসেছে। আগামী ১৫ জুন বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য কলকাতায় আসছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

লক্ষ্মণানন্দ-হত্যার তদন্তে সরকারের গড়িমসি : ভর্ৎসনা ওড়িশা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বয়োবৃদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী মহারাজের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করল মহামান্য ওড়িশা হাইকোর্ট। গত দু'বছর ধরে ওড়িশা রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই তদন্ত চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের ২৩ আগস্ট ওড়িশার কন্ধমাল জেলার জলসপেটা আশ্রমে জন্মাষ্টমী উৎসবের প্রাক্কালে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা রাতেরবেলায় চড়াও হয়ে গুলি চালিয়ে কুপিয়ে খুন করে স্বামী লক্ষ্মণানন্দসহ তাঁর চারজন শিষ্যকে। জনজাতিদের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যায় চার্চ মদতপুষ্ট একশ্রেণীর মাওবাদী সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা জড়িত বলে পরে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। ২০০৮ থেকে রাজ্য সরকারের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করছে। এখনও পর্যন্ত দু'দফায় মোট চৌদ্দ জনের নামে চার্জশীট দায়ের করা হয়েছে। এযাবৎ মাত্র নয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, তদন্তের কাজে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী মাধবচৈতন্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন। মাধবচৈতন্য মহারাজ প্রশ্ন তুলেছেন—পুলিশ এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মোটিভ ও ষড়যন্ত্রের দিকটা আদৌ খতিয়ে দেখছে না। সেজন্য একটি স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো দরকার।

রিট আবেদনকারীর উকিল এম এন কৃষ্ণমণি (সর্বোচ্চ আদালতের বরিষ্ঠ ব্যবহারজীবী) বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের আগে স্বামীজীকে কয়েকটি উড়ো চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে খতম করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এদিক থেকে পুলিশ কোনওকিছু খতিয়ে দেখেনি। পুলিশ স্থানীয় চার্চ এবং মাওবাদীদের যোগসাজশ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। শ্রীকৃষ্ণমণি হাইকোর্টে সি বি আই তদন্তের জন্য আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর আরও বক্তব্য, ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই সংবেদনশীল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অগ্রগতি তো করেইনি উল্টে মামলা হালকা করার চেষ্টা করছে যাতে হত্যাকারীদের তেমন কোনও সাজা না হয়। স্থানীয় চার্চের গৃহীত প্রস্তাবে স্বামীজীকে হত্যার যে কথা ছিল তা সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার পর মাননীয়া বিচারপতি কুমারী সঞ্জু পণ্ডা ক্রাইম ব্রাঞ্চকে নতুন করে বিস্তারিতভাবে তদন্তের সময়সীমা বাড়িয়ে হলফনামা জমা দিতে বলেছেন। নির্দ্ধারিত সময়সীমা ২৯ জুন—তাও বিচারপতি তাঁর নির্দেশে বলে দিয়েছেন। এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে প্রাপ্ত সূত্রে জানা গিয়েছে—প্রথম সারির মাওবাদী নেতা দুনা কেশব রাও ওরফে আজাদ আত্মসমর্পণ করেছে। এখবর পাওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওড়িশা পুলিশের একদল হায়দরাবাদ রওনা হয়েছে তাকে 'রিমাণ্ডে' নেওয়ার জন্য।

২০০৮-এ স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী'র নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে তাকেই মূল ষড়যন্ত্রকারী বলে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল অরবিন্দ রাও গত বুধবার (১৮ মে) জানিয়েছিলেন। তারই নেতৃত্বে চল্লিশজন সশস্ত্র মাওবাদী কন্ধমাল জেলার জলসপেটাতে লক্ষ্মণানন্দজীর আশ্রমে ওই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল বলেই পুলিশের ধারণা।

দলিত থেকে 'মহাদলিত'-এ বিভক্ত করছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মায়াবতীর 'দলিত রাজনীতি'-র মোকাবিলায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার 'মহাদলিত' রাজনীতি করতে চলেছে। যতদূর খবর—দলিতদের মধ্যে আবার বিভাজন করে কেন্দ্র 'মহাদলিত' নামে নতুন এক বি পি এল শ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের জাত-পাত কেন্দ্রিক রাজনীতি সবার জানা। ওই দুই প্রদেশ থেকে একচেটিয়া 'দলিত ভোট' পেয়ে দীর্ঘদিন (১৯৮৪ পর্যন্ত) কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৮৯-এ কংগ্রেসের সৃষ্ট বেড়াল 'বি পি মণ্ডল কমিশন'-কে ঝুলি থেকে বের করে দলিত মিথ ভেঙে দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস ফেরৎ ভি পি সিং। তখন 'রামবাণ' নিয়ে আসরে নামে বিজেপি। তাতে জাত-পাত সব একাকার হয়ে 'রাম' নামে মাতোয়ারা হয় উত্তরপ্রদেশ। আবারও মুলায়ম সিং মুসলিম-যাদব (M-Y) সমীকরণ করে মুসলিম ও যাদব ভোটব্যাঙ্ক-এর সাহায্যে ফাঁকতালে উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতা দখল করে। তখন থেকে আজ অবধি নানা প্যাঁচ পয়জার করেও হালে পানি পায়নি কংগ্রেস। মুলায়মের সঙ্গে থেকে ও পরে আলাদা হয়ে মায়াবতী ও কাঁসিরামের বহুজন সমাজবাদী পার্টি বা বি এস পি 'দলিত ভোটব্যাঙ্ক'কে কব্জা করে বর্তমানে একক শক্তিতে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতাসীন। একদা মুলায়মকে টাইট করতে মায়াবতীকে যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছিল কংগ্রেস।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে মায়াবতী-মুলায়ম কেউই উত্তরপ্রদেশের রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসকে বিশেষ পাত্তা দিতে চায়নি। অনেক আশা করে কংগ্রেস যুবরাজ রাহুল গান্ধীকে দিয়ে রোড শো করালেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। 'যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে'র জন্য কৃষকদের জমি অধিগ্রহণে কৃষকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলিতে দুজনের মৃত্যুকে পুঁজি করে সম্প্রতি আবার রাস্তায় নামেন রাহুল। প্রথমে ধর্নায় বসেন ও পরে গ্রেপ্তার হন। সোজা কথায় উত্তরপ্রদেশের দলিত মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী রায়বেরিলির সাংসদকেও রেয়াৎ করেননি। তখনই মায়াবতীর ব্যাপক দলিত সমর্থনকে কায়দা করার কথা হাইকম্যান্ডের মাথায় আসে। আগামী বৃহস্পতিবারের (২৬ মে) মধ্যে এই নতুন 'মহাদলিত' শ্রেণী তৈরির বিষয়টা ক্যাবিনেটের বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা। তপসিলি জাতির মধ্যে যারা আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং ভূমিহীন, গৃহহীন ও নামেমাত্র সরকারি চাকরি করেন, এমন লোকেদেরই 'মহাদলিত' সংজ্ঞা দেওয়া হবে। কংগ্রেস মনে করছে এর ফলে উত্তরপ্রদেশের দলিত মুখ্যমন্ত্রীকে একটা ভালোরকম ধাক্কা দেওয়া যাবে। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে বি পি এল সেনসাসকে ভিত্তি করে আর কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট তাতে সীলমোহর দেবে। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের জনৈক অফিসারের বক্তব্য—আমরা পশ্চাৎপদ এবং দলিতদের মধ্যে দরিদ্রতম লোকেদের উন্নয়ন এবং শক্তিশালী করতে চাই। ২০০৭ সালে প্রথমবার এন সি সাক্সেনা কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল বি পি এল নির্দ্ধারণের নীতি বিষয়ে। সেখানে বিশেষ নজর দিয়ে মহাদলিতদের খুঁজে বের করে স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে 'বি পি এল' তালিকাভুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। এবিষয়ে সাক্সেনাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছেন, ''পুয়োরেস্ট অ্যামং দি পুয়োর এবং ব্যাকওয়ার্ড অ্যামং দি ব্যাকওয়ার্ড।'' তার মতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং অসমে বড় সংখ্যায় মহাদলিতরা বসবাস করেন। আসলে ভারতবর্ষের জনসমাজকে জাত- পাত-এর ভিত্তিতে নানাভাবে ভাগ করে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারিগর কংগ্রেসই ব্যুমেরাং হওয়াতে আরও ভাগাভাগির চক্রান্ত করা হচ্ছে।

দুর্নীতি, ব্যর্থতা আর অপদার্থতায় ভরা দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের রিপোর্ট-কার্ড

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার তৃতীয় বছরের যাত্রা শুরু করেছে। এখনই সময় পর্যালোচনার যে কী পেলাম এবং কী পেলাম না। প্রথমেই মনে রাখতে হবে স্রেফ বিগত দুই বছরই নয়, কংগ্রেসের এই সরকার টানা সাত বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে। অর্থাৎ, যথেষ্ট সময় পেয়েছেন সোনিয়া-মনমোহন সিং-রা দেশের মানুষের কল্যাণসাধনে। কিন্তু দেশের মানুষ বিগত সাত বছরে মনমোহন সিং এন্ড কোং-এর কাছ থেকে কী পেয়েছেন তার তালিকাটাতে চোখ রাখি। গত ১২ মাসে মোট ৯ বার পেট্রল, ডিজেল ও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। শীতের সময় মরশুমি শাকসবজির সরবরাহ বাড়ে এবং দাম কমে। এবার তা' হয়নি। ফলন বা সরবরাহ বিঘ্নিত হয়নি। শুধু দাম এতটাই বেশি যে সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে ছিল। এখন গরমকাল। বাজারের জিনিসপত্রের আগুন দাম অব্যাহত। সোজা-সাপ্টা বলতে গেলে বলতে হয় পেট্রোপণ্যের থেকে শুরু করে আলু পেঁয়াজ চাল আটা ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণে কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।

পিছন ফিরে তাকালে মনে পড়বে গত বছর ২২ মে ইউপিএ সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনটি শুভ ছিল না। ওইদিন সকালে ম্যাঙ্গালোরে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় প্রায় ১৫০ বিমান যাত্রীর। এত বড় একটি বিমান দুর্ঘটনার সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই বিমান চালকের উপর। বলা হয়েছে, বিমান চালকদের গাফিলতিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এটা কোনও কাজের কথা নয়। বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' থেকে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়। এক্ষেত্রেও জানা গিয়েছে। কিন্তু সেই তথ্য দেশবাসীকে জানানো হয়নি। কেন? দোষ শুধু ইউপিএ সরকারকে দিলেই হবে না। সংসদে বিরোধী দলের সাংসদদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। ম্যাঙ্গালোরের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পূর্ণ তদন্ত রিপোর্ট সংসদে রাখতেই হবে এমন দাবিতে তখন সংসদ অচল করেছিলেন তাঁরা এমনটা শুনিনি। যেমনটি সাম্প্রতিককালে টু জি স্পেকট্রাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিরোধীরা করেছিলেন। যে কারণে আজ ডি এমকে দলের মন্ত্রী, নেত্রী, সাঙ্গোপাঙ্গোরা তিহার জেলে। অথচ দেশের বৃহত্তর বিমান দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা কোনও শাস্তি পেল না। দুই মৃত বিমান চালকের উপর সব দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে মন্ত্রী, কর্তারা দিব্যি বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষমতাসীন সরকার তার

ব্যর্থতা, অপদার্থতা সর্বদাই আড়াল করার চেষ্টা করে। এইজন্যই গণতন্ত্রে বিরোধী দলের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যায় করে সরকার যদি পার পায় তবে তার দায়িত্ব নিতে হবে বিরোধীদেরও। তাঁরাও

গূঢ়পুরুষের

কলম

সমানভাবে সমালোচিত হবেন।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সরকারি প্রশাসনে মন্ত্রী আমলাদের সীমাহীন দুর্নীতি। মনমোহন সিং সরকারের দুর্নীতির সঙ্গে তুলনা চলতে পারে নরসীমা রাওয়ের সরকারের আমলের। মনমোহন সিং সরকারের দ্বিতীয় দফার যাত্রার দ্বিতীয় বছরেই কমনওয়েলথ গেমসের জন্য বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করে গেমসের আয়োজকরা কংগ্রেস নেতা সুরেশ কালমাদির নেতৃত্বে দল বেঁধে তিহার জেলে বাস করছে। সেখানে তাদের সঙ্গী স্পেকট্রাম কাণ্ডের হাই প্রোফাইল বন্দিরা। সেদিক থেকে দেখলে দিল্লীর তিহার জেল এখন চাঁদের হাট। দেশের গণ্যমান্য কংগ্রেসীরা, শিল্পপতিরা সেখানে এখন জোর আড্ডা দিচ্ছে। কে নেই সেখানে? মুম্বাইয়ের বহুতল আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারির খলনায়করা, কালো টাকার কুখ্যাত ব্যবসায়ী হাসান আলি, পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের কূটনৈতিক প্রতিনিধি আই এফ এস মাধুরী গুপ্তা, টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজা, মন্ত্রীর 'প্রিয় বান্ধবী' ডি এমকে সাংসদ কানিমোঝি। এক কথায়, তিহারে এখন নরক গুলজার।

ব্যর্থতার শেষ এখানেই নয়। এই তালিকায় আছে সি ভি সি পদে পি জে টমাসের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সততা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে। কারণ, মনমোহন সিং জানতেন টমাস কেরলে অফিসার থাকার সময় আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সেই দুর্নীতির মামলা এখনও চলছে। এমন এক ব্যক্তিকে ভারতের সর্বোচ্চ দুর্নীতি দমন সংস্থার প্রধান নিয়োগ করতে মনমোহন সিং-রা হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আর্থিক সংস্কার করা হবে। করা হয়নি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জমি অধিগ্রহণ সংশোধনী বিল এনে জমির মালিক, কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে। করা হয়নি। পাকিস্তানে দেওয়া 'মোস্ট ওয়ান্টেড' অপরাধীদের তালিকায় বড় ধরনের ভুলভ্রান্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মুখ পুড়িয়েছে। এক কথায়, দ্বিতীয় দফার ইউ পি এ সরকারকে রিপোর্ট কার্ডে গর্ব করে বলার মতো কিছুই নেই। এরপরেও সাম্প্রতিক পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস খুব একটা খারাপ ফল করেনি। কেন? আপনারাই বলুন। কারণ, পাঠকরাই শেষ কথা বলেন। কলমটি নয়।

স্লোগান উঠেছে— ‘গ্যাং অফ ফোর হটাও, সি পি এম বাঁচাও’

নিশাকর সোম

৪৩ জন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে রাজ্যপাটে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লাস-উদ্দীপনা-উত্তেজনায় ভরপুর নয়া শাসকগোষ্ঠী, অপর দিকে পরাজিত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব—কাদা ছোঁড়াছুড়ি শুরু এবং তা চলবেই। সিপিএমের হারের নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণগুলি হলো—বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির নিচের তলার সভ্য সমর্থক অনুরাগীগণ সিপিএমকে ভোট দেয়নি। তারা সকলেই তৃণমূল জোটকে ভোট দিয়েছে। কারণটা স্পষ্ট। নিজ নিজ দলের নেতারা প্রকাশ্যে বলেছিল---সিপিএম লুম্পেনদের পার্টি, গুণ্ডাছাড়া কিছু জানে না। মমতা আমাদের নেত্রী, মমতার আন্দোলন সঠিক, মুখ্যমন্ত্রী অন্যদলের মন্ত্রীদের পাত্তা দেন না, তিনি অহংকারী-দাম্ভিক। এইসব বক্তৃতার মোদ্দা কথা হলো সিপিএমকে ভোট না দিয়ে কাট-টু-সাইজ করা—যে কথা বারংবার এই কলামে লেখা হয়েছিল। ভোটের তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করা এখনই সম্ভব না হলেও প্রাথমিক কয়েকটা কথা বলা যায়। যেমন--- (১) মুসলিম সম্প্রদায় সিপিএমকে অত্যন্ত কম ভোট দিয়েছেন। রাজাবাজারের মনসুর, আশিস মিঞা, খোদা বক্স, জব্বার, নিরু এদের আড্ডায় গিয়ে বোঝা যায় যে গরীব মুসলিমদের রেজ্জাকের কথামতো গায়ে পাউডার-সুগন্ধি লাগিয়ে টানা যায় না। রাজাবাজারের বিড়ি মজদুর সংগঠনও তৃণমূলের পক্ষে গেছে। (২) সিপিএম মহঃ সেলিমকে সংখ্যালঘুদের মধ্যে কাজ করতে বলেছিল। তিনি পেয়েছিলেন খরচ করার জন্য অর্থ, আর মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা। তাই শুধু রাজাবাজারই নয়; এন্টালী, কসবা, পার্ক সার্কাস-এ মুসলিম ভোটে ধস। গার্ডেনরিচ- মেটিয়াবুরুজে তো আগের নির্বাচনেই তদানীন্তন মন্ত্রী মহঃ আমীন পরাজিত হয়েছিলেন। এবারে এ সমস্ত এলাকাতেও সব জায়গাতেই তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হয়েছে। আবার তপশিলি জাতি উপজাতিদের মধ্যে সিপিএম কোনও কোনও জেলায় লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের থেকেও কম ভোট পেয়েছে। খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে আরও ভয়াবহ চিত্র দেখা যাবে। যতই ছাত্র-যুব সংগঠনের রমরমা দেখা যাক—নবীন ভোটারদের বেশিরভাগ সিপিএম বিরুদ্ধে গেছে। আসলে সিপিএম-এর যুব-ছাত্র কর্মীদের বেশিরভাগ অরাজনৈতিক ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির অবক্ষয়ী ধারক-বাহক। কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই অবক্ষয়ী সংস্কৃতি প্রচারের চটুল সঙ্গীত প্রচার করা হয়েছিল। ছাত্র-যুব ফ্রন্টের দায়িত্বে থাকা নেতারা এতে কিছুই হস্তক্ষেপ করেনি।

এবারের নির্বাচনের প্রচারে সিপিএম নেতারা গলা ফাটালেও সিপিএমের সংগঠনের সব পার্টি সভ্য, এ জি সদস্য, এমনকী ব্রাঞ্চ সম্পাদক, এল সি এস শেষ পর্যন্ত কাজে নামেননি। তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন, এই ‘কীর্তনে’র দূরে থাকি যাতে পরে তৃণমূলের আক্রমণের স্বীকার না হতে পারি।

সিপিএম পরিচালিত বস্তি ফেডারেশন যেটি কাগুজে সংগঠন, তার সদস্যগণ কি সিপিএম-কে ভোট দিয়েছেন? দেননি—কিন্তু কেন দিলেন না? একটা কথা। গৌতম দেব যখন পোড়া কুপন এবং তথাকথিত তৃণমূল নেতার চিঠি নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত থাকলেন, তখনই কিন্তু তৃণমূল নেত্রী জেতার ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেললেন।

এতে ইন্ধন জোগাল অনিল বসু, সুশান্ত ঘোষ, বিমান বসুদের বক্তব্য। ‘কমরেডরা’ উর্ধ্ববাহু হয়ে আগাম জয়ের চিন্তায় উল্লাস করলেন। আর জনগণ তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল আর এখন বিমানবাবুর দল বলছেন, নিচের তলার রিপোর্ট ভুল ছিল। অথচ তিনিই বলেছিলেন, ১৯৯টি কেন্দ্রে জিতবই। বিমান-নিরুপম-গৌতম এখন নিজেদের দ্বন্দ্ব স্থগিত রেখে একসুরে নিচের তলার কর্মীদের দোষ দেখাচ্ছেন। বলির পাঁঠা হচ্ছেন নিচের তলার কর্মীরা। সিপিআই-এর মঞ্জু মজুমদার বলেছেন,সিপিএমেরই প্রধান দায়িত্ব এই পরাজয়ের। ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্য করেননি। তিনি দাম্ভিক-অহঙ্কারী।’’ কিরণময় নন্দ বলেছেন, ‘‘লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরেই আমাদের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তাহলে এরকম কলঙ্কজনক অবস্থায় পড়তে হোত না। সিপিএম ছোট দলগুলিকে কোনও সমস্যার কথা জানাতো না। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতো।’’ যতদূর মনে হচ্ছে, কিরণময়ের দল শীঘ্রই বামফ্রন্টে থাকা, না-থাকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। এখন তো ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষও আর বামফ্রন্টের সভায় আসবেন না বলে জানা যাচ্ছে। বামফ্রন্ট-এর অস্তিত্ব থাকবে কিনা তাই এখন একটা বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন।

রাজ্য সিপিএম-এর বুদ্ধ-নিরুপম-গৌতম-বিমান— এই ‘গ্যাং অফ ফোর’ সমস্ত দোষ নিচের তলার কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ‘অফেন্স ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স’ নীতি নিয়েছেন। তবে একা রেজ্জাক মোল্লা নয়, বহু রেজ্জাক মোল্লা তৈরি। পার্টি-নেতাদের অপসারণের জন্য তারা দাবি জানাবে। যদি তা হয় সিপিএম আবার ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়বেই।

সিপিএমের পলিটব্যুরো রাজ্য-সিপিএমের নেতৃত্ব এবং রাজ্য-সরকারের নেতৃত্ব-কে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছে। কিন্তু রাজ্য সিপিএম-এর বুদ্ধ-নিরুপম-গৌতম-বিমান—এই ‘গ্যাং অফ ফোর’ সমস্ত দোষ নিচের তলার কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ‘অফেন্স ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স’ নীতি নিয়েছেন। তবে একা রেজ্জাক মোল্লা নয়, বহু রেজ্জাক মোল্লা তৈরি। পার্টি-নেতাদের অপসারণের জন্য তারা দাবি জানাবে। যদি তা হয় সিপিএম আবার ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়বেই। পলিটব্যুরোর সভায় সিপিএম নেতাদের কাছে প্রশ্ন উঠেছে,

(১) কেন তাঁরা মানুষের এই পরিবর্তনমুখী নীরব অভিযান বুঝতে ব্যর্থ হলেন?

(২) কেন নিচের তলার রিপোর্ট সম্পর্কে যাচাই করলেন না?

(৩) প্রতিটি ভোটারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না—এ সত্য জানলেন না কেন?

(৪) ঘরে বসে স্ক্রুটিনি রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে—এটা ঠেকানো হয়েছিল কি? আসলে নিচের তলার ‘কমরেডরাই’ টের পেয়েছিল পরিবর্তন হবেই। তাই গা-ছাড়া কাজ করেছিলেন তাঁরা।

সিপিএম-এর ভিতরে দ্বন্দ্বের তীব্র প্রকাশ দেখা যাবে পার্টি-সম্মেলনে। সিপিএমের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি—অস্ত্রের ঝনঝনানি-এর ঘটনা বাতিল করা যায় না। একেই বলে মুষলপর্ব। সিপিএম-এর মুষলপর্ব কি শুরু হলো?

তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ নাগপুরে গত ১০ মে থেকে শুরু হয়েছে। নবনির্মিত মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই বর্গের উদ্বোধন করেন নাগপুরের মেয়র শ্রীমতী অর্চনা দেহনকর (Dehankar)। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবোলে, বর্গের সর্বাধিকারী টি ভি দেশমুখ ও বর্গ কার্যবাহ শশীকান্ত দীক্ষিত। তিরিশ দিনের এই বর্গে সারা দেশ থেকে ৭৩৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২০ জন এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ৩ জন শিক্ষার্থী এবছর তৃতীয় বর্ষের বর্গে শিক্ষার্থী হিসাবে গিয়েছেন। মেয়র শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, নাগপুরের মেয়র হিসেবে তিনি গর্বিত কেননা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই শহরকে শ্রদ্ধা করে।

শ্রী হোসবোলে বলেন, জাতীয় জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা কাজ করলেও সঙ্ঘের প্রধান কাজ হচ্ছে ব্যক্তি নির্মাণ। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের ব্যক্তি নির্মাণের কার্যপদ্ধতি নানা দিকে থেকেই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বর্তমান ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স যেভাবে প্রশিক্ষণ দেয় তা ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রদর্শিত কার্যপদ্ধতিরই অঙ্গ।

শহুরে গরীব

এতকাল যদি জেনে এসে থাকেন গরীবের কাছে আবার শহর, গ্রাম কি, তবে এই সাম্যবাদী ধারণা আপনাকে পাল্টাতে হবে। কারণ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন গরীবের নবতর কিছু সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেশের দারিদ্র্য বিচার করতে বসেছেন। এই সংজ্ঞা মেনে যে ব্যক্তি মাসে অন্তত ৫৭৮ টাকার বেশি আয় করেন তাকে মোটেও গরীব বলা চলে না। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি জানিয়েছেন, শহরে বাসস্থানকারী কোনও ব্যক্তির দৈনিক আয় ২০ টাকার ওপরে হলে গরীবের নবতর সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকে আর গরীব বলা যাবে না। অর্থাৎ ৩০ টাকা কেজি চাল, ১০০ টাকা কেজি ডাল, ১৫ টাকা কেজি নুনের দরের বাজারে দৈনিক ২০ টাকা রোজগার করা মানুষটি কোনও সামাজিক ও সরকারি সুযোগ-সুবিধে পাবেন না এবং বিপিএল তালিকাভুক্ত হবেন না। আর যাঁরা গ্রামে বাস করেন, গরীবের তকমা না পাবার জন্য দৈনিক ১৫ টাকাই সেক্ষেত্রে কাফি। মাঝে মধ্যে সন্দেহ হয়, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে বাস করছি না কি বিংশ শতাব্দীর? তবে বিশ্ব-বাজারে দারিদ্র্যহীন ভারতবর্ষের ছবি তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উর্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা না করে পারা যাচ্ছে না।

কোটিপতি বিধায়ক

হুঁ, হুঁ বাবা! বিধায়ক হওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার! ওসব দেশসেবা-টেসসেবা দিয়ে মান্ধাতার আমলে বিধায়ক হোত মশাই। আজকালকার দিনে কেউ হয় না। এখন ট্যাঁকের জোর চাই বুঝলেন। নইলে দেখুন না কেন, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস অ্যান্ড ন্যাশনাল ইলেকশান ওয়াচ বলছে সদ্য-সমাপ্ত অসম, কেরল, পন্ডিচেরী, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নব-নির্বাচিত (পুনর্নির্বাচিতেরা এই তালিকায় নেই) প্রতি তিনজন বিধায়কের মধ্যে একজন কোটিপতি। এর মধ্যে অসমে কোটিপতি বৃদ্ধির সংখ্যা সর্বাধিক। সবমিলিয়ে ২৬৮ জন বিধায়কের মধ্যে ৯৭ জনই কোটিপতি সেখানে। এদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সবার পেছনে। অন্য একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে বিধায়ককুলের (যাদের অধিকাংশই বাম) বাংলায় সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে কম। নিন্দুকেরা বলছেন, যে রাজ্যের একদা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়েও কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে না, সম্পত্তি বলতে নগদ হাজার পাঁচেক টাকা; সেই জাতীয় দুর্জনদের নাকি ছলের অভাব হয় না!

বিদেশ-ই যোজনা

অর্থমন্ত্রকের অধীন ভারতীয় যোজনা কমিশনের যোজনা বিদেশে-ই নির্ধারণ হচ্ছে কি না, এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গতভাবেই উঠে পড়েছে। সৌজন্যে—যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। যিনি ২০০৪-এর জুনে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন। ২০১১-এর জানুয়ারি অবধি তাঁর 'যোজনা কমিশনীয়' কর্মজীবনে ২৭৪টি সরকারি কাজের দিন বিদেশে কাটিয়েছেন (প্লেন ভ্রমণ-এর দিনগুলি ছেড়ে দেওয়ার পরে এহেন কর্মদিবস বিদেশে নষ্টের পরিসংখ্যান) এবং ৪২ বার সরকারি বিদেশ সফর করেছেন। তথ্য জানার অধিকারবলে এও জানা গিয়েছে ৪২ বারের মধ্যে ২৩ বার আমেরিকায় এবং বাকিগুলোর মধ্যে রয়েছে ইংলন্ড, মুসক্যাট, দুবাই, ইথিওপিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, মরক্কো, বাহরিন, সিঙ্গাপুর, জাপান ও চীন। এর জন্য আপাতত তাঁর খরচ হয়েছে ২.৩৪ কোটি টাকা। প্রশ্নটা উঠছে, এদেশের যোজনা কি বিদেশে হয়? না কি যোজনা কৃত লগ্নীর ঘাটতি পড়েছে? যে যোজনা কমিশনের ডেপুটি-চেয়ারম্যানকে স্বয়ং চেয়ারম্যান (অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি)-কেই উপেক্ষা করে ছুটতে হয় বিদেশে! তবে পাঠকের জ্ঞাতার্থে তথ্য—এক পয়সা লগ্নীও এতদিন পর্যন্ত ভারতে ঢোকেনি মন্টেকের হাত ধরে।

অঙ্গনা-রা

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন। যিনি স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন তো বটেই, বরং শুধু সমর্থক থেকেই ক্ষান্ত হননি—স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার লক্ষ্যে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ (এমনকী নিজের পরিবারের মধ্যেও) নিয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার কাজটা এ্যাদ্দিনে অনেকটা এগোলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার কাজটা কদ্দূর সমাধা হয়েছে এনিয়ে একটা গুরুতর সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। তবে অঙ্গনা-রা উৎসাহিত হতেই পারেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জয়ললিতা শপথ নেওয়ার পর ভারতে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল চার (বাকি দু'জন দিল্লীর শীলা দীক্ষিত আর উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী)। তার ওপর এদেশের রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা (প্রতিভা পাতিল), লোকসভার অধ্যক্ষ একজন মহিলা (মীরা কুমার), শাসক দলের সর্বেসর্বা, তিনিও একজন মহিলা (সোনিয়া গান্ধী)। আর কে না জানে সিপিএমে বৃন্দা কারাত আর বিজেপি-তে সুষমা স্বরাজের দাপট কতখানি! সুতরাং মানতেই হচ্ছে, যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা আনে, সেই গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন অঙ্গনারাই।

রাজ্যের আগামী ভবিষ্যৎ কার হাতে ?

শ্যামল কুমার হাতি

> আসলে তখন কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টে ভীষণ মাখামাখি। একে অপরের পরিপূরক। যদি এসব না থাকত তা হলে এত দেরী হোত না সিপিএমের দর্পচূর্ণ হতে। এতদিন সিপিএম ছিল বহাল তবিয়তে। তারজন্য কংগ্রেসীদের অনেক অবদান আছে। তাইতো প্রথম ইউ পি এ সরকারের ঘাটতি সংখ্যা তারাই মিটিয়েছে।

বাংলায় দীর্ঘ ৩৪ বছর পর সরকার বদল হলো। যদিও ওই সরকারের বহু আগেই চলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। রাজ্যের মানুষও তৈরি ছিলেন। তবে উপযুক্ত কাণ্ডারী পাননি তাঁরা। ২০১১-তে এবার বাংলার মানুষ তা পেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রধান কাণ্ডারী কিন্তু 'নির্বাচন কমিশন'। তারা যে ভাবে শক্ত হাতে হাল ধরেছে তা একটু আলগা হলেই ভরাডুবি হোত। অতীতে বাংলা পেয়েছিল বামফ্রন্ট, পরবর্তীকালে তা হয়েছিল 'উন্নততর বামফ্রন্ট'। এতে সাধারণ মানুষের লাভ কিছুই হয়নি। যা লাভ হয়েছিল তার সবটুকু খেয়েছে দলের লোকজন। ক্ষুধার্ত মানুষ, দরিদ্র মানুষ সব কিছুই চোখের সামনে দেখেছে। একদিকে উপোসী মানুষের লম্বা মিছিল আর অন্যদিকে নামে সর্বহারারা সর্বপ্রাপ্তিতে পরিণত হয়েছে। মানুষের মুখের খাদ্য ও ভাষা দুই কেড়ে নিয়েছিল ওইসব সরকারী দলের কর্মী ও সমর্থকেরা। মানুষ অন্নহীন ভাষাহীন হয়ে দিন কাটিয়েছে। গণতন্ত্র ছিল তাদের কাছে উপহাসের সামগ্রী। ভোট ও ভোটযন্ত্র ছিল যন্ত্রণা। চারিদিকে দমবন্ধ করা পরিবেশ। মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল, আর ধৈর্য ধরতে পারছিল না। প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না, প্রতিবাদ করলেই মারণ অস্ত্র মজুত ছিল ওদের হাতে, তাই যা হচ্ছে তাই হোক, সবাই চুপচাপ। নেতারা নিরাপত্তা পেয়ে মাঝে মধ্যে চেঁচামেচি করত। ব্যাস, ওইটুকুই সার। এটাই ছিল ওদের নিয়তি। ভোট হবে, প্রহসন হবে, এরাই থেকে যাবে। এই ভাবেই বছরের পর বছর চলছিল বাংলা।

সিপিএম এবং তার শরিক দলের লোকেরা ভেবে নিয়েছিল এই ভাবেই চলবে তাদের স্টীমরোলার অনন্তকাল। ওদের সাধারণ কর্মীদের দোষ নেই। তারা তো নেতাদের কথা শুনে ধরেই নিয়েছিল কেউ আর কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে না, যদি কেউ অবাধ্য হয় তা হলে তার জন্যে ব্যবস্থা তো আছেই। বিশ শতকের শেষের দিকে বিজেপি মাথা তুলতেই মানুষ সমর্থন দিয়েছিল। প্রায় ১২ শতাংশ ভোট তারা পেয়েছিল। তখন তৃণমূলের জন্ম হয়নি। সেদিন বিজেপি'র কর্মীদের রক্তে লাল হয়েছিল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। যেখানেই বিজেপি'র মিটিং, সেখানেই ভীড়। জ্যোতিবাবু তখন বাংলার মসনদে। ততদিনে বাংলায় কোনও কোনও কংগ্রেস নেতার নামের পাশে 'তরমুজ' শব্দ বসিয়েছিল আর এক শ্রেণীর কংগ্রেসীরা। একদিকে বিজেপি তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাংলার বঞ্চিত, রিক্ত মানুষ ও কর্মী সমর্থকদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে আর অন্যদিকে কংগ্রেস ভ্রাতৃঘাতী কায়দায় নিজেরা লড়ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল যুব-কংগ্রেসীরা। সিপিএম তারিয়ে তারিয়ে তা উপভোগ করছিল। কালক্রমে মমতা ব্যানার্জীকে সীতারাম কেশরী কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেন। বিজেপি মমতার দুর্দিনে মমতাকে পূর্ণ সমর্থন করে। মমতা অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণীর সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পান। জন্ম হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। টি এম সি বিজেপি জোট বাঁধে নির্বাচনের সময়। রাজ্যে একসঙ্গে আন্দোলন হয়নি বললেই চলে। মমতা ব্যানার্জীর টি এম সি এখানে বড় দল। রাজ্য বিজেপি ছোট দল। মমতা ইচ্ছা মতো আসন বণ্টন করতে থাকেন। তা রাজ্য বিজেপি'র মনমতো না হলেও কেন্দ্রীয় নেতাদের চাপে তা তারা মানতে বাধ্য হোত। যেমন এবার রাজ্য কংগ্রেসকে মানতে হয়েছে। যতদিন গেছে বিজেপি'র স্থান টি এম সি দখল করেছে। বিজেপির সমর্থন কমতে শুরু করে তা মমতা ব্যানার্জীর দলকে শক্তিশালী করেছে। কালক্রমে ২০১১-তে তা মমতার নেতৃত্বে পরিবর্তনের হাওয়ায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সঠিক পরিচালনায় মানুষ নিজের ভোট নিজেই দিতে পেয়েছেন। সবাই প্রফুল্ল মনে ভোট দিয়ে নির্বাচন কমিশনের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছেন, তাকে সাবাস বলেছেন। মানুষ সিপিএমের দর্প চূর্ণ করেছে, অত্যাচারীরা আজ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। মানুষের মুখে আজ হাসি। এতদিন যারা পদে পদে অপমান করেছে আজ তারাও অপমানিত।

তবু এই নির্বাচন অনেক কিছু ঠিক করে দিয়েছে। প্রণব মুখার্জী আজ ভীষণ খুশী। তিনি তাঁর খুশী চাপতে না পেরে মিডিয়ার সামনে বলেই ফেলেছেন ''বহুদিন পর কংগ্রেস নিজের ক্ষমতায় রাজ্যসভায় সদস্য পাঠাতে পারবে।'' একদম বাস্তব কথা। যদি এর আগে তাঁকেই সিপিএমের দাক্ষিণ্যে রাজ্যসভায় না যেতে হোত তাহলে ভাল হোত। আসলে তখন কংগ্রেস ও

কম্যুনিস্টে ভীষণ মাখামাখি। একে অপরের পরিপূরক। যদি এসব না থাকত তা হলে এত দেরী হোত না সিপিএমের দর্পচূর্ণ হতে। এতদিন সিপিএম ছিল বহাল তবিয়তে। তার জন্য কংগ্রেসীদের অনেক অবদান আছে। তাইতো প্রথম ইউ পি এ সরকারের ঘাটতি সংখ্যা তারাই মিটিয়েছে। এত কিছুর পর হয়তো রাজ্য কংগ্রেস আর পিছনে দেখতে নাও চাইতে পারে। তাতে দোষ নেই। তবে এবার আসলে বিপদ হবে কংগ্রেসের। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল আজ অন্যের দয়ায় বাঁচছে। এটাই বাস্তব। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে এবার সিপিএমের শরিক দলের মতো অবস্থা হবে কংগ্রেসের। সংগঠন করতে পদে পদে বাধা পাবে। কোনও ভাল সংগঠক সংগঠন করলেও লাভ নেই। নির্বাচনের সময় ওই আসন নাও পাওয়া যেতে পারে। যা পাবে হাসিমুখেই তা নিতে হবে। এইতো নির্বাচনের আগে বৈদ্যুতিন মিডিয়াতে দেখেছিলাম মানস ভুঁইয়ার মুখে রামপেয়ারী রামের প্রশংসা। যারা পাড়ায় পাড়ায় সংগঠন গড়ে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হওয়ার কথা ভাবছেন তাঁদের আশাহত হতে হবে। কত জায়গায় প্রণব-মানসের কাপড় কংগ্রেসের কর্মীরা খুলে নেবে তা ওরাই জানে।

তবে একটা রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হবেই। বঞ্চনার নতুন খাতা খোলা হবে। বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বাড়বে এবং তা খুব দ্রুতই। যদি রাজ্য বিজেপি পূর্ণদ্যোমে কাজ শুরু করে তাদের এবার বাংলার মানুষ দেখবে। কাজের লোক চাই। বহু ইস্যু না ধরে বাছা বাছা ইস্যু ধরে এগোতে হবে। মানুষ বেশী তত্ত্ব শুনতে চায় না। তারা চায় মাটির কাছাকাছি মানুষ। বিজেপি নেতা ও কর্মীদের মাটির কাছের মানুষ হতে হবে। এবারের ভোটে বিজেপির হারাবার কিছুই নেই। রাজ্য বিজেপি নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। এবার যে ভোট বিজেপি পেয়েছে তা মোটেই সামান্য নয়। দই পাততে গেলে অল্প একটুখানি দই (দম্বল) মিশিয়েই প্রচুর পরিমাণে দই তৈরি করা যায়। বিজেপির এবারের ভোটই তার পাথেয়। এই নিয়েই এগুতে হবে। মানুষের প্রতিদিনের দুঃখকষ্টের সাথী হতে হবে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যেন পাশে বিজেপি কর্মীদের পায়। তাহলেই হবে। মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। ৩৬৫ দিন কাজ করতে হবে। মাঝে নির্বাচন আসবে তাতেও অংশগ্রহণ করতে হবে। তারপর আবার কাজ। এই ভাবে চললেই জনতা-জনার্দন পাশে এসে দাঁড়াবেন। দরিদ্র মানুষের কাজ ভগবানের কাজ। তাদের দেবজ্ঞানে পূজা করতে হবে। বিজেপি'র কাছে নৈতিক শক্তি আছে। যা অন্য দলের নেই। এবার কাজের সময়। এবার সকলকে নিয়ে চলতে হবে। সকলকে নিয়ে চলার কৌশল রপ্ত করতে হবে। রাজনীতি কোনও শর্টকাট মেথড্ নয়। এটা একটা লংটার্মপ্রসেস। এটা মনে রাখলেই হলো। এবার নতুন প্রভাত তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল আজ অন্যের দয়ায় বাঁচছে। এটাই বাস্তব। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে এবার সিপিএমের শরিক দলের মতো অবস্থা হবে কংগ্রেসের। সংগঠন করতে পদে পদে বাধা পাবে। কোনও ভাল সংগঠক সংগঠন করলেও লাভ নেই। নির্বাচনের সময় ওই আসন নাও পাওয়া যেতে পারে। যা পাবে হাসিমুখেই তা নিতে হবে।

পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র

অতিথি কলম

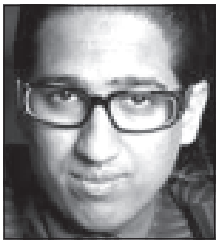

অরিন্দম চৌধুরী

অল্প কিছুদিন আগে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল পরভেজ মুসারফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার যা মনে হয় তা সোজাসুজি বলি। তিনি (ওসামা বিন লাদেন) মারা গেছেন। কারণ তিনি কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। আমি জানি না, তিনি এখন আফগানিস্তানে সবরকম চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন কিনা।

এরপর খবর দেখা যাক। ২০১১ সালের ১-২ মে। ওসামা বিন লাদেন, যিনি আল কায়দার প্রধান, তাঁকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়েছে।

২০০৬ সালে মুম্বাই নগরীতে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে বোমা রেখেছিল সিমি লস্কর-ই-তৈবা আর আই এস আই। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল আই এস আই। এই হামলায় ৫৮ জন মারা যান। এখন নিষিদ্ধ হওয়া ছাত্রসংগঠন সিমা (স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া) এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদ সক্রিয় রয়েছে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে। তাদের পুরোদস্তুর মদত মিলেছে আল কায়দা আর অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের কাছ থেকে। যাদের মূল ঘাঁটি পাকিস্তানে। ভারত

আমেরিকা প্রথম থেকে জানত পাকিস্তান লুকিয়ে রেখেছে ওসামা বিন লাদেনকে এবং মদত দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে। তারা ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ জানত ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানকে দরকার।

এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ইসলামাবাদ আর পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমির নাকের ডগায় আবতাবাদে ওসামা বিন লাদেনের বহাল তবিয়তে নিরাপদে অবস্থানের ব্যাপারটা পাকিস্তান সরকার ভালোভাবেই জানত। এবং সেই বন্দোবস্ত সরকারি সমর্থন ছাড়া হয়নি।

আল কায়দা এবং ওসামা বিন লাদেন শুধু নয়, সন্ত্রাসবাদের নিয়ন্ত্রক আবু জুবাদাকে পাওয়া গেছে ফয়সালাবাদের এক নিরাপদ বাড়িতে। আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার মূল কলকাঠি যে নেড়েছিল সেই রায়জি বেন আলসিবকে ধরা হয়েছে করাচিতে। খালিদ শেখ মহম্মদকে ধরা হয়েছে রাওয়ালপিন্ডিতে। একই ঘটনার সূত্র ধরে বলা যায়, ওইসব সন্ত্রাসবাদীদের পাকড়াও করা হয়েছে পাকিস্তানে বা পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে নয়, একেবারে পাকিস্তানের ভিতরে নগর এলাকায়।

২০০৮ সালের মুম্বাই হানার পিছনে হাত ছিল লস্কর-ই-তৈবার। পাকিস্তানে তারা এখনও সক্রিয়। প্রায় একদশক আগে টাইম পত্রিকা লেখে, পাকিস্তানে ফৌজের মদতে লস্কর-ই-তৈবার সদস্যরা তালিম নিয়েছে। এবং তাদের কৌশলে আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার করিয়ে ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পাকিস্তান ফৌজ। ২০০১ সালে ভারতের সংসদ ভবনে হামলা চালিয়েছিল ভালোভাবে প্রশিক্ষণ-পাওয়া পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা। পরে জানা গেছে এই আক্রমণের পিছনে আই এস আইয়ের হাত ছিল।

সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে পাকিস্তানের ভূমিকাটা জানা যায় যখন আজমল কাসব ধরা পড়ে ২০০৮-এর নভেম্বরে মুম্বাই হামলায় জড়িত থাকার জন্য। পাকিস্তান একেবারে বজ্জাতের ভূমিকা নিয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতার ক্ষেত্রে। শুধু ভারতের কাছে দিনে দিনে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে না, বিশ্বের নিরাপত্তাও তাদের জন্যে বিঘ্নিত। তবে আমাদের বুঝতে হবে হুমকি শুধু পাকিস্তান থেকে আসছে না, আসছে আমেরিকা থেকেও। আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করেছে। কারণ লাদেন তাদের উপর হামলা চালাবার সাহস বা ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। কারও কখনও ভোলা উচিত হবে না, ওসামা বিন লাদেনকে সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। উদ্দেশ্য ছিল সংযুক্ত সোভিয়েত রিপাবলিককে ধ্বংস করা। আমেরিকার সাধারণ রীতিনীতিই হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওইভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

সোভিয়েত ভাঙার জন্যে ওসামা বিন লাদেনকে কাজে লাগানোর সঙ্গে আশপাশের দেশের রাষ্ট্রপতিদের হত্যা করেছে নির্মমভাবে। সেইসঙ্গে নির্লজ্জের মতো বোমা বর্ষণ করে কব্জা করেছে সেইসব দেশ, যাদের দরকার তেলের জন্যে। আমেরিকার সরকার এসব করেছে বহুবছর ধরে। এখন আমেরিকা যে কাণ্ড করছে লিবিয়াতে তা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। ৪০ বছরের একটা পুরনো বিষয় তুলে বদলা নিতে চাইছে। কর্নেল গদ্দাফি তেল উৎপাদক দেশদের একত্রিত করেছিলেন নিজেদের স্বার্থে, যাতে তেলের উৎপাদন এবং তার দরুন প্রাপ্য টাকা থেকে কোনও দেশ বঞ্চনার শিকার না হয়। পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রচুর তেল যাতে যথেচ্ছভাবে পশ্চিমের দেশগুলো নিতে না পারে। এখন সেই পুরনো রাগে একবারে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমেরিকা বোমা বর্ষণ করেছে লিবিয়ার উপর। অসংখ্য সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। কারণ আর কিছু নয়—শুধু তেল।

আমেরিকা প্রথম থেকে জানত পাকিস্তান লুকিয়ে রেখেছে ওসামা বিন লাদেনকে এবং মদত দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে। তারা ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ জানত ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানকে দরকার। আমেরিকা সেইসব সন্ত্রাসবাদীদের সরাতে চেয়েছে যারা আমেরিকার পক্ষে বিপজ্জনক। এখন পাকিস্তান পৃথিবীর প্রধান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। এই সত্য তথ্যটা স্বীকার করতে চায় না আমেরিকা।

আশ্চর্যের ব্যাপার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা এখনও পাকিস্তানকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগী হিসেবে। আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় পাকিস্তানকে কিছু জানায়নি এমন যুক্তি মানা শক্ত। বরং বলেছিল এই ব্যাপারটা করা হচ্ছে যে সন্ত্রাসবাদীকে আমেরিকা জন্যে হয়ে খুঁজছে সে যাতে অন্য নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে না পারে। সেজন্যে পাকিস্তানকে যেটুকু না জানালে নয় সেইটুকু নিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করে আমেরিকা।

সন্দেহ নেই, আমেরিকা একটা মস্তবড় কাজ করেছে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। কিন্তু সেই কাজ তারা করেছে নিজেদের স্বার্থে। এই হত্যার মধ্যে দুটো জিনিস বোঝা যাচ্ছে। প্রথমত, পাকিস্তান একটি ভয়ঙ্কর দেশ। যে দেশ ওসামা বিন লাদেনের মতো মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দেয় সে দেশ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা এর পরেও পাকিস্তানকে ভয়ঙ্কর দেশ বলে চিহ্নিত করছে না। বলছে না, পাকিস্তানকে বিশ্বাস করা যায় না।

পারমাণবিক চুল্লি থেকে নিরাপত্তার চুক্তির সময়ে ভারত নিজেকে বিক্রি করেনি আমেরিকার কাছে। এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের নীতি স্পষ্ট ছিল। অন্য যেসব দেশ পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছিল সেই তালিকার শীর্ষে ছিল আমেরিকাই। ***(সৌজন্যে : দিপাইওনীয়ার)***

আমেরিকা, ওসামা বিন লাদেন এবং পাকিস্তান

বাসুদেব পাল

ওবামা আর ওসামা। প্রথমজন সারা পৃথিবীতে ইসলামী একাধিপত্য স্থাপনের জন্য জেহাদ বা সন্ত্রাসবাদের নিষ্ঠুরতম প্রয়োগকেই মাধ্যম করেছেন। অন্যজন গায়ের জোরে অর্থাৎ এখনকার জমানায় সামরিক শক্তির বলে সারা বিশ্বকেই নিজের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে বদ্ধ-পরিকর। আমেরিকার

রাষ্ট্রপ্রধান বারাক হুসেন ওবামার রাষ্ট্রের বনিয়াদই হলো খৃস্টান ধর্মমতভিত্তিক সভ্যতা। আর ওসামা বিন লাদেনের হলো কট্টর আগ্রাসী জেহাদি ইসলাম। সুতরাং এক্ষেত্রে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল হান্টিংটনের ভবিষ্যদ্বাণীকে অনুসরণ করে দুটি পরস্পর বিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষের কথা (Clash of Civilization) বলা যেতেই পারে। ওসামা বিন লাদেনের 'আল কায়দা' দুর্ধর্ষ ইসলামী জেহাদি সংগঠন। তারই আত্মঘাতী জঙ্গি সৌদি আরবজাত মহম্মদ আটা ও তার সঙ্গীরা আমেরিকাতেই বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে আমেরিকার বিশাল বিমানের পাইলটের জায়গা দখল করে সোজা গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল আমেরিকার নিউইয়র্কস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারে। পরপর দুটি বিমানের বিশেষ ধরনের জ্বালানীর তেলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় টুইন টাওয়ার। একই সঙ্গে গুড়িয়ে যায় গর্বোদ্ধত আমেরিকার যাবতীয় দর্প, দম্ভ ও অহংকারও। তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ।

তখন থেকেই আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ হন্যে হয়ে আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের খোঁজে নেমে পড়ে। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর লাদেনের ডেরা আফগানিস্তানের উপর সরাসরি আক্রমণ নামে আমেরিকান সেনা। এক্ষেত্রে সহযোগী হয় তাদেরই বিশেষ অনুগ্রহে ও সর্বাধিক আর্থিক মদতে পুষ্ট পাকিস্তান। যা আজ বিশ্ব-মানচিত্রের আর এক সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করাটা আমেরিকার পক্ষে একান্তই জরুরী ছিল।

এসবই একরকম পুরনো কথা। তবে মুসলমান পিতা (মূল— কেনিয়ান নিগ্রো) এবং খৃস্টান মাতার (আমেরিকান) সন্তান যিনি নিজেকে খৃস্টান বলে দাবী করেন, তাঁর নির্দেশেই যে লাদেনের মৃত্যু ঘটবে—এই ভবিতব্যটা অনেকেরই বোধগম্য না হওয়াটা স্বাভাবিক। অনেকবারই অনেক নেতা ও দেশ আমেরিকাকেই দাদাগিরি করার জন্য সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রধানকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করেছিল বা করছে, যেমন লিবিয়ার মুয়াম্মার গদ্দাফি। ওবামা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ওদেশে বসবাসকারী এন আর আই-রা অনেকেই বলেছিলেন ওবামার কাছে ভারত নয়, পাকিস্তানই স্বাভাবিক মিত্র। ইদানীং মুসলমান রাষ্ট্রে একনায়কদের গদিচ্যুত করার যে প্রয়াস চলছে তাতেও নাকি আমেরিকার 'পরোক্ষ হাত' রয়েছে বলে অনেকের অনুমান।

৫৭০ খৃস্টাব্দ থেকেই হিন্দু ভারতবর্ষ ইসলামী সন্ত্রাসের শিকার। যার চরম পরিণতি মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ এবং সর্বশেষ উদাহরণ ২৬/১১/০৮ মুম্বাইয়ে পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদীদের হামলা। বৈশ্বিক ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকার জোটসঙ্গী হয়েছে পাকিস্তান। আর সেই জোট সঙ্গীর সহযোগিতা এতটাই যে, আমেরিকা হন্যে হয়ে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে কিনা পাকিস্তানেই বহাল তবিয়তে। লাদেন নিকেশ হওয়ার পর পাকিস্তানী শাসকরা যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন, ঝুলি থেকে 'গট আপ' কেসের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। আল কায়েদার উত্থানে নিজেদের অবদানের কথা আমেরিকা নিজেও অস্বীকার করতে পারে না। আশির দশকে আফগানিস্তানে রাশিয়ার মদতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত বারবাক কারমাল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আদাজল খেয়ে লেগেছিল আমেরিকা—ভায়া পাকিস্তান। তার নীটফল হলো, আফগানিস্তানে তালিবানী জমানা, পাক-আফগান তালিবানদের হাতে ব্যাপক পরিমাণে আমেরিকান

সমরাস্ত্র। পাক-আফগান সীমান্তে জেহাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভারত, বাংলাদেশ, সুদান থেকে বাছাই করা মুসলমান যুবকদের সন্ত্রাসবাদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ। যে সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গিদেরও (যেমন অসমের উলফা) ভারতকে বিধ্বংস ও বিধ্বস্ত করার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে ওই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশেও ডালপালা বিস্তার করে। ভারতবর্ষের জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আজ জেহাদিদের রমরমার এটা একটা বড় কারণ। লাদেনের মৃত্যুসংবাদ আসার পর বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের এক বিদগ্ধ ইসলামি অধ্যাপক বলেছেন, বাংলাদেশে আল কায়েদা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত বিবিধ নামে সক্রিয় জেহাদি সংগঠনের সংখ্যাটা কমপক্ষে ৩৬টি। একইরকমভাবে শুধুমাত্র অসমেই ইসলামি জেহাদি সংগঠনের সংখ্যা ব্যাপক বেড়েছে। পাকিস্তানকে কৃতিত্ব দিতেই হবে—আমেরিকার সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও, আমেরিকার কাছে ব্যাপক আর্থিক সাহায্য ও সামরিক অস্ত্রসম্ভার পাওয়া সত্ত্বেও তাদের হাত থেকে ওসামা বিন লাদেনকে নিজেদের দেশে লুকিয়ে রাখা। আর আমেরিকার কৃতিত্ব হলো পাকিস্তানী সেনা ও গোয়েন্দা বিভাগ (আই এস আই)-কে ম্যানেজ করে কম্যান্ডো হানায় অ্যাবোটাবাদের নিশ্চিন্ত বাসস্থান থেকে লাদেনকে হত্যা করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা। এটা মোটেই বিশ্বসযোগ্য নয় যে, পাকিস্তানের অগোচরে আমেরিকার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' দুর্বৃত্তকে নিকেশ করা। কার সঙ্গে আমেরিকা কী রফা করেছিল তা হয়তো ভবিষ্যতে জানা যেতে পারে, নাও পারে। তবে লাদেনের মৃত্যুর সঙ্গেই আল কায়েদার বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী জেহাদ শেষ হয়ে গেল ভাবলে ভুল হবে। এ কথাটা আমেরিকাও জানে, জানে পাকিস্তানও। পাকিস্তানী আল-কায়েদাপন্থীরা দেশের সরকারকে দায়ী করে নিরীহ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষজনের উপর হামলা চালু করেছে। ২ মে'র পরবর্তী হামলা ও বিক্ষোভে শতাধিক পাকিস্তানীর মৃত্যু ঘটেছে। তবে আল কায়েদা'র বিশ্বব্যাপী মজবুত শক্তিশালী নেট-ওয়ার্ক আমেরিকানদের ওপর বদলা নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে। সতর্কতায় একটু ঢিলে দিলেই আঘাত নেমে আসবে। ভারতকে মনে রাখতে হবে, তারাও কিন্তু আল কায়েদার নিশানায় রয়েছে। পাকিস্তান যেনতেন প্রকারেণ ভারতের রক্তক্ষরণ চায়। ২৬/১১ মুম্বাইয়ে জঙ্গি হানার কথা ভুলে গেলে চলবে না। ভারতের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মজবুত গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের দক্ষতায় 'প্রশ্নচিহ্ন' এঁকে দিয়েছে। তা না হলে ভারত যে ৫০ জন মারাত্মক জঙ্গির তালিকা পাকিস্তানকে দিয়েছে তাদের একজন যে মহারাষ্ট্রের থানেতে একবছর ধরে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে—সেটা সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশ করেছে। আর এ খবর স্বরাষ্ট্র দপ্তরই জানে না!

এবার লাদেন-এর উত্থান-পতনের এক ধারাবাহিক ঘটনাক্রমে চোখ বোলানো দরকার বলে মনে হয়—

● জন্মস্থান : সৌদি আরব, ১৯৫৭ সাল। বাবা মহম্মদ বিন লাদেনের ৫২ জন সন্তানের মধ্যে সপ্তদশ। মহম্মদ লাদেন দেশে রাস্তা তৈরির বড় ঠিকাদার ছিলেন।

● সৌদি আরবের জেড্ডায় সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময়েই মৌলবাদী কট্টরপন্থী মুসলমান শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্ত হন।

● ১৯৭৯-তে রাশিয়ান বাহিনী আফগানিস্তান দখল করলে লাদেন মুজাহিদিনদের সঙ্গে মিলে গিয়ে রাশিয়ান ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন দশ বছরেরও বেশি।

● সে সময় আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ মারফত আফগান মুজাহিদিনদের অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লাদেনও ছিলেন।

> **"লাদেনের মৃত্যুর সঙ্গেই আল কায়েদার বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী জেহাদ শেষ হয়ে গেল ভাবলে ভুল হবে। এ কথাটা আমেরিকাও জানে, জানে পাকিস্তানও।"**

● ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যেকার কোনও সময়ে লাদেন 'আল কায়েদা' প্রতিষ্ঠা করেন।

● লাদেনের প্রিয় এ কে ৪৭ (বাঁ হাতে ধরা)-এর নলটা হঠাৎ করে আমেরিকার দিকে ঘুরে যায় যখন ১৯৯১-এর খাড়ি যুদ্ধের সময়ে প্রায় তিন লক্ষ আমেরিকান সেনা সৌদি আরবে ঘাঁটি গাড়ে।

● ১৯৯৩-এ ওসামা বিন লাদেনের উদ্যোগে নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র আক্রান্ত হয়। দু'বছর বাদেই গাড়ী-বোমা বিস্ফোরণে সৌদি আরবের রিয়াধে ১৯ জন আমেরিকান সেনা নিহত হয়।

● ১৯৯৬-এ ওসামার সৌদি নাগরিকত্ব নাকচ করে দেওয়া হয়। লাদেন আবারও আফগানিস্তানে ফিরে যান। সুদানও সেদেশে তাঁর ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেয়।

● ১৯৯৮-এ এক ফতোয়া জারি করে লাদেন বলে দেন, ইহুদী ও আমেরিকানদের এবং তাদের সহযোগীদের হত্যা করা বৈশ্বিক জিহাদের অঙ্গ এবং তাদের হত্যা করা মুসলমানদের পবিত্র কর্তব্য।

● এর ছয়মাস বাদেই আল কায়েদা জঙ্গিরা কেনিয়া ও তানজানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে হামলা করে। ২২৪ জন নিহত এবং ৫০০০ জন আহত হয়। আমেরিকা ওসামাকেই প্রধান ষড়যন্ত্রী বলে চিহ্নিত করে, তার সঙ্গে অন্য ১৬ জন ওসামা-সহযোগীকেও।

● ২০০০-এ আল কায়েদা জঙ্গিরা ইয়েমেনের এডেন বন্দরে আমেরিকার একটি রণতরীতে হামলা চালায়। ১৭ জন আমেরিকান নাবিক নিহত এবং আরও ৩৯ জন আহত হয়।

● ৯.১১ আমেরিকার গর্বোদ্ধত টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর এফ বি আই (আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা) ওসামা বিন লাদেন-এর মাথার দাম বা পুরস্কার ২৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার ধার্য করে।

● ২০০১-এই আমেরিকা তালিবানদের শক্ত ঘাঁটি আফগানিস্তান আক্রমণ করে। ওসামা আফগানিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় তোরাবোরা গুহায় আত্মগোপন করেন পাক আফগান সীমান্তে।

● চার বছর বাদেই আমেরিকান দ্রোণ ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বাঁচতে লাদেন পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদের সুরক্ষিত বাসস্থানে চলে যায়। সেখানেই আমেরিকা তাকে খতম করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সব থেকে উল্লসিত আমেরিকা এবং সতর্কও। তবে সবচেয়ে বিপদ হবে ভারতের। আমেরিকান অস্ত্রে বলীয়ান পাকিস্তানের প্রথম নিশানাই ভারতবর্ষ।

রাষ্ট্রপতি বরাক হুসেন ওবামা আগেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। লাদেন মেরে এখন তিনি আমেরিকানদের কাছে 'হিরো', জাতির অবিসম্বাদিত নেতা। গত দশকে ওসামা ছিলেন হাড়হিম করা বৈশ্বিক সন্ত্রাসের মূর্তিমান চেহারা।

প্রখ্যাত সাংবাদিক এম জে আকবরের কথায়—"ভয়টা ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে এলে তত ভয়ানক নয়। যে জেহাদি সন্ত্রাসবাদী আদর্শ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মাটিতে জাঁকিয়ে বসেছে, ভয় সেখানে। একটি মধ্যযুগীয় ধর্মমতভিত্তিক তালিবানী চিন্তাধারা কাবুল এবং ইসলামাবাদে শিকড় গেড়ে আশপাশের দেশগুলোকেও সন্ত্রাস-জেহাদের বিষে জর্জরিত করছে।

ওবামা যেমন 'শত্রু' চিহ্নিত করছেন, তেমনই বন্ধুকেও তাঁকেই বাছাই করতে হবে।"

এপারের সন্ত্রাস ওপারের আঁতুড়ে

অর্ণব নাগ

পাকিস্তানের মাটিতে সে দেশের সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে 'অপারেশন লাদেন' চালিয়ে এক দশক আগে নিজেদের দেশে সংঘটিত ৯/১১-এর শেকড়টিকে সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করতে পেরেছে আমেরিকা। তবে এর মানেই যে 'বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদ চিরতরে নির্মূল হয়ে গেছে'—এহেন মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন না কেউই। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতেই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে যে, বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদ চিরতরে নির্মূল করতে আমেরিকা কি আদৌ আন্তরিক? সঙ্গত প্রশ্ন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ৯/১১-র ষড়যন্ত্রীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আমেরিকা ভারতের মুম্বাইয়ে ২০০৮-এ সংঘটিত ২৬/১১-র ষড়যন্ত্রকারী ও কৌশলগত কারণে আমেরিকারই 'কূটনৈতিক মিত্র' পাকিস্তানকে ভারত-বিরোধিতার ক্ষেত্রে পরোক্ষ মদত যুগিয়ে গেছে। এতে আমেরিকার কাজের কাজ কতটা হয়েছে পাক-মাটিতে লাদেন ধরা পড়ার পর তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। তবে আখেড়ে যে ভারতেরই ক্ষতি হয়েছে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আমেরিকা যে ৯/১১-কে রুখতে, ২৬/১১-কে মদত দিতে বদ্ধপরিকর তা পরিষ্কার হয়ে গেছে মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র মার্ক টোনারের কথায়। লদেন হত্যার পর যিনি বলেছেন—৯/১১-এর সঙ্গে ২৬/১১ বা অন্যান্য জঙ্গি হামলাকে মিলিয়ে দেখা অনুচিত।

আমেরিকার এহেন 'গ্রীন সিগন্যাল' পেয়েই ভারত-বিরোধিতায় সুর-সপ্তমে তুলেছে পাকিস্তান। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ কিংবা দেশজুড়ে অশান্তি, ২০০১-এ সংসদভবন হামলা কিংবা ২০০৮-এ মুম্বইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসের কায়া আর পাকিস্তানের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। ভারত- বিরোধী ষড়যন্ত্রের মূল কারিগরেরা পাকিস্তানের নিশ্চিন্ত ছত্রতলে। একথা জেনেই আমেরিকার ওসামা-বধের পর উৎসাহিত ভারতীয় সেনাপ্রধান বলেছিলেন, 'ওসামাকে ধরার জন্য আমেরিকা যে রকম অভিযান চালিয়েছে, ২৬/১১-এর চক্রীদের ধরার জন্য পাক-ভূখণ্ডে সেরকম অভিযান চালানোর ক্ষমতা রাখে ভারতও।' বলা বাহুল্য ফোঁস করে উঠেছে পাকিস্তান। তাদের বিদেশ সচিব সলমন বশিরের বক্তব্য—''ভারত যদি আমেরিকাকে অনুকরণ করতে যায় তাহলে প্রলয় বাধবে।'' আসলে আমেরিকাও খুব ভাল করেই জানে, পাক-প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী মুখে যতই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে হম্বি-তম্বি করুন না কেন সেদেশের প্রশাসনের ওপর ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণটুকুও সরকারের নেই, সেটা আছে সেনাবাহিনীর অর্থাৎ সেনাপ্রধান কিয়ানি-র হাতে। আর এক্ষেত্রে কিয়ানির মদতদাতা পাক-গোয়েন্দা বাহিনী আই এস আই প্রধান সুজা পাশা। আর আই এস আইয়ের সঙ্গে জঙ্গিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কিংবা পাক-সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ যে জেহাদিদেরই হাতে একথা কারুরই আর অবিদিত নয়। সব জেনেও নিজেদের দেশে ৯/১১ পুনর্বার সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রুখতে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে পাকিস্তানকে মদত দেওয়া ছাড়া আমেরিকার তাই গতি নেই। একনজরে দেখে নেওয়া যাক এমন চার সন্ত্রাসবাদীকে যাদের ভারতের মাটিতে সন্ত্রাস কায়েম করার জন্য এদেশের সরকার হন্যে হয়ে খুঁজছে আর তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে এগিয়ে এসেছে পাকিস্তান।

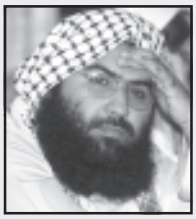

মৌলানা মাসুদ আজহার :

১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় এয়ার লাইন্স বিমান ছিনতাইকারী জঙ্গিরা বিমান-যাত্রীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ভারতীয় জেলে বন্দী মৌলানা মাসুদ আজহারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জয়েশ-এ মহম্মদের নেতা আজহার, আফগানিস্তানের তালিবান নেতা মোল্লা ওমরের মতো একই ধর্মীয় পাঠ নিয়েছে। সেই দিক দিয়ে আজহার আর ওমরকে সতীর্থ বলা চলে। ভারতীয় জেল থেকে মুক্ত হবার পরের বছরই অর্থাৎ ২০০০ সালে জয়েশ-এ-মহম্মদ নামে একটি জঙ্গিগোষ্ঠী তৈরি করে আজহার যা আদতে পুরনো নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী হরকত-উল-আনসারের প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে কাজ করতে থাকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে। বলা বাহুল্য, বর্তমানে অশান্ত কাশ্মীরের জন্য জয়েশকেই সর্বাগ্রে দায়ী করা চলে। নয়াদিল্লীতে ২০০১-এর ১৩ ডিসেম্বর সংসদভবন হামলার ঘটনায় লস্করের সঙ্গে যোগ ছিল জয়েশেরও।

এখন কোথায়? : পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর প্রদেশে মৌলানা মাসুদ আজহার প্রকাশ্যে কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দাউদ ইব্রাহিম

এই ব্যক্তিটিকেই এখন যেনতেন প্রকারণে ধরতে মরিয়া ভারত। ভারত- বিরোধী বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে জাল ছড়িয়ে আল কায়েদা এবং অন্য পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অস্ত্র- পাচারের বিপজ্জনক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে সে। ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণের মূলচক্রী ইব্রাহিমের সঙ্গে আই এস আই-এর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর ধারণা করাচিকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে কাজ চালাচ্ছে দাউদ। মাসখানেক আগে চেন্নাইয়ে সাদিক বাচারের রহস্যময় মৃত্যুর তদন্তে নেমে সিবিআইয়ের অনুমান টু-জি স্পেকট্রাম কাণ্ডের যাবতীয় নথি ও তথ্য-প্রমাণাদি লোপাট করতে দাউদ ঘনিষ্ঠ সাদিক সিবিআইয়ের প্রধান কার্যালয়টি ওড়ানোর ষড়যন্ত্র করছিল। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে, কারণ প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার মূল মস্তিষ্ক ছিল এই সাদিক-ই।

এখন কোথায়? : দাউদের মেয়ে ফেসবুকে যে 'স্ট্যাটাস ম্যাসেজ' পাঠিয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় দাউদ এখন করাচিতেই রয়েছে। যদিও দাউদের হদিশ (অনেকটা লাদেনের মতোই) পাকিস্তান এখনও করতে পারেনি বলেই সরকারিভাবে জানাচ্ছে। দাউদ কন্যা মাহরুখ ইব্রাহিমের ২০১০-এর ফেসবুক প্রোফাইলে মন্তব্য করা হয়েছে, ''হারিয়ে যাওয়া মা ও বাবা এবং জুনেদ, রেনজ, মোমেন, মাজিয়াসহ প্রত্যেকে করাচিতে রয়েছে।'' প্রসঙ্গত, জুনেদে'র স্ত্রী হলো এই মাহরুখ। আর জুনেদ হলো ক্রিকেটার জাভেদ মিঁয়াদাদের পুত্র। মাহরুখ এও জানিয়েছেন যে ক্লিফটনের একটি স্কুলে পড়াশুনো তার। ভারতীয় গোয়েন্দারা বহুদিন ধরেই দাবী জানিয়ে আসছেন করাচির বাজার-সংলগ্ন এলাকা ক্লিফটনে বাস করে দাউদ।

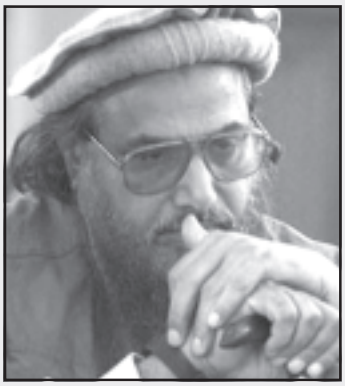

হাফিজ মহম্মদ সইদ

লস্কর-এ-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের জঙ্গিপনাকে মুখোশের আড়াল দিতে তৈরি হওয়া জামাত-উদ্ দাওয়া-র প্রধান হলো এই হাফিজ সঈদ। লস্কর ঘনিষ্ঠ এই ব্যক্তিটি বহুদিন যাবৎ ভারত বিরোধিতার ক্ষেত্রে সক্রিয়। লস্করের প্রধান লক্ষ্য জম্মু ও কাশ্মীর এবং এ ব্যাপারে হাফিজের প্ররোচনামূলক বক্তব্য—''ভারত যতদিন জম্মু-কাশ্মীরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকবে ততদিন সেখানে শান্তি ফেরার কথা ভাবা দুরাশা মাত্র। ভারতকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যাতে তারা আপনাদের (অর্থাৎ কাশ্মীরের মুসলমানদের) সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে এবং ক্ষমা চাইবে।''

জঙ্গি কার্যকলাপ : ২০০১-এর ১৩ ডিসেম্বর লোকসভা আক্রমণের ঘটনায় যুক্ত ছিল হাফিজ। ২০০৬-এর ১১ জুলাই মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণের মূলচক্রী হিসেবে নাম উঠে এসেছিল তার। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর (২৬/১১) মুম্বইয়ে তাজ, ওবেরয় ইত্যাদিতে পাক-জঙ্গিদের হামলার পর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সঈদ আর তার দল জামাত-উদ্-দাওয়াকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর তালিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করবার আবেদন জানালে সেই আর্জি গৃহীত হয়। লস্করের সঙ্গে হাফিজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ মেনে নেয় রাষ্ট্রসঙ্ঘও।

শেষ দেখা : হাফিজের অবস্থান যে পাকিস্তান, এটা কোনও গোপন ব্যাপার নয়। লাহোরের মার্কাজ আল-কোয়াদসিয়ায় নিহত সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জামাত-উদ্-দাওয়ার জঙ্গিদের সমাবেশে তাকে দেখা গিয়েছে। ওসামা-র দেহ জলে ভাসিয়ে দেবার পর শ্রদ্ধা জানানোর ওই বিশেষ প্রার্থনা আয়োজিত হওয়ায় হাফিজের শ্রদ্ধাভাজনদের তালিকায় যে ওসামা রয়েছে তা নিশ্চিত।

জিয়া-উর-রহমান লাকভি :
চাচাজি নামে পরিচিত এই সন্ত্রাসবাদীটি লস্কর-এ-তৈবার মিলিটারি কম্যান্ডার। মুম্বাই আক্রমণের সময় অপহৃত মাছ ধরার নৌকাটি থেকে স্যাটেলাইট ফোনে ডাকা হয়েছিল রহমানকে। ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হিসেবে চিহ্নিত লাকভি ইসলামাবাদেই কোনও গোপন ডেরায় রয়েছে বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর।

এছাড়াও লস্করের সিনিয়র কম্যান্ডার ইউসুফ মুজাম্মেল এবং মাসুদ আজহারের ভাই মহম্মদ ইব্রাহিম আতহার আলভি-কে হন্যে হয়ে খুঁজছে ভারত। ইউসুফের সঙ্গে ইয়াহুয়া নামের জনৈক বাংলাদেশীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে যে তাকে জাল পরিচয়-পত্র ও সিম কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ভারতে নাশকতায় সহযোগিতা করতে। ১৯৯৯ সালে মাসুদ আজহারকে ছাড়াতে ভারতীয় বিমান অপহরণে যোগ দিয়েছিল আলভি।

এছাড়া আরও কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীকে সেদেশে আশ্রয় দিয়ে কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত যুগিয়ে ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করছে পাকিস্তান। যেমন লন্ডনের হিথরোতে ২০০৬-এ জঙ্গিরা তরল বিস্ফোরক দিয়ে এয়ারক্র্যাফট উড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল রশিদ রউফের নেতৃত্বে। যার ভারত-বিরোধী জঙ্গি কাজকর্মের বেশ কিছু প্রমাণ গোয়েন্দাদের হাতে রয়েছে। ২০০৭-এ পাকিস্তানের জেল ভেঙে সে পালায়। ২০০৮-এ আমেরিকার আক্রমণে তার নিহত হবার কথা সংবাদমাধ্যমে এলেও তার পরিবারকে উদ্ধৃত করে কয়েকটি সূত্র রউফের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অনেকেরই আশঙ্কা, রশিদ নিশ্চিন্তে রয়েছে পাকিস্তানেরই ছত্র-তলে। সুলেমান আবু ঘাইত, আবদুল্লা আহমেদ অবদুল্লা, আদনান আল সুকরি জুমা, গুলাম মুস্তাফা, আনাস আল লিবি—এইরকমই কয়েকটি জঙ্গির নাম যাঁদের বিরুদ্ধে আমেরিকাসহ ইউরোপ ও ভারতে নাশকতা চালানোর সুস্পষ্ট প্রমাণ করেছে। আই এস আই ও পাক-সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এরা পাকিস্তানেই গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলে মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনী সি আই এ এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' মনে করছে।

বৃটিশ অভিভাবকরা বেয়াড়া ছেলেদের মানুষ করাতে চান ভারতীয় পরিবারে রেখে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বেয়াদব ছেলে-পিলেদের জ্বালায় যুক্তরাজ্যের অস্থির অভিভাবকরা এখন নিরুপায় হয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন ভারতীয়দের কাছে। গতি আর প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুক্তরাজ্যের বাড়ন্ত ছেলেদের দস্যিপনা বেড়ে যাচ্ছে। নানাভাবে মনস্তত্ত্ববিদদের পরামর্শ নিয়ে বা কাউন্সিলিং করে 'বাবাবাছা' বলে কোনও সুরাহা হচ্ছে না। আত্মজদের তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দায়মুক্ত হওয়ার মতো নিষ্ঠুর জন্মদাতা-দাত্রী সবদেশেই কম। সাহেবদের দেশেও। বাবা মা চাইছেন সুখী পরিবার। পারিবারিক সুখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সুসন্তানের জনক-জননী হওয়ার গর্ব এবং নিশ্চিন্ততা। বড় বেশিমাত্রায় বাস্তববাদী অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের মন বুঝতে চাননি বা সে ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

ফলে তাঁরা এখন দিশেহারা। ছেলেরা ঠিকমতো মানুষ না হলে তাঁদেরই তো দায়ী করবে দেশ সমাজ। নিজেরাও সবসময় যন্ত্রণা অনুভব করবেন। তাঁরা পরামর্শ চেয়েছেন বিবিসিতে। ভারতীয় পরিবারে ছেলেমেয়েদের জন্যে শাসন আর স্নেহ এমনভাবে মিশে থাকে যা পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়তর করে। ভারতীয় পরিবারের আদর্শ অনুসরণ করলে ছেলেমেয়েদের জীবনধারায় শৃঙ্খলা আনা যেতে পারে। সেইজন্যই এখন বিবিসি পুনায় খোঁজ করছে কড়া ধাঁচের বাবা মায়ের। যাঁদের মাধ্যমে বৃটিশ বেয়াড়া ছেলেছোকরাকে জব্দ করা যাবে। বিবিসি ওইরকম কিছু আদর্শ পরিবার খুঁজে পেয়েছে পুনেতে।

বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি যুক্তরাজ্যে একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে প্রচার করে ''পৃথিবীর কড়াধাঁচের বাবা-মা'' এই নামে। দুবছর বাদে টেলিভিশনের লোকজন এসেছিল কড়ামেজাজি বাবা-মার সন্ধানে। সেরকম বাবা-মাকে দিয়ে অনুষ্ঠান করে বিবিসি। উদ্দেশ্য নিজের দেশের ছেলেপিলের স্বভাব বদল করা।

২০০৯ থেকে একটা ধারাবাহিক চলছে। পুণাবাসী এম সি উন্নিকৃষ্ণন তাঁর স্ত্রী মধু আর ছেলে সিদ্ধার্থকে নিয়ে কাহিনীর বিন্যাস। দারুণ সাড়া ফেলেছে। ধারাবাহিক দেখে ইংল্যান্ডের অনেক অভিভাবক ভাবছেন ছেলেমেয়েকে ভারতীয়দের কাছ থেকে আচার-ব্যবহার শেখার জন্যে পাঠাবেন। ধারাবাহিকের কাহিনীতে রয়েছে দুটি বেয়াড়া ছেলেকে

বিদেশে পাঠানো হয়েছে একটি পরিবারে থেকে তালিম নিতে। বলা হচ্ছে, এক সপ্তাহ কোনও ভারতীয় পরিবারে থাকলে বেয়াড়া শিশু কিশোরদের মেজাজ ও মানসিকতা অনেকটা বদলে যেতে পারে। উন্নিকৃষ্ণন থারমাকস গোষ্ঠীর প্রধান। বেয়াড়া শিশুদের টিট করে তাদের সুপথে আনার ব্যাপারে তাঁকে একেবারে আদর্শ মানুষ মনে করছেন বৃটিশ অভিভাবকরা। কারণ তাঁরা মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চাইছেন ছেলেমেয়ের মধ্যে। এদেশের ছাত্ররা ওদেশে যায়, ওদেশের ছাত্ররা এদেশে আসে—এটা প্রচলিত রীতি। এখন বৃটিশ সমাজবিদরা ভাবছেন ছাত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটু অদলবদলের কথা। ইংরেজ পরিবারের বেয়াড়া ছেলেদের আদর্শ পরিবারের ঘেরাটোপের মধ্যে কিছুদিন রাখলেই তারা অনেকটা পাল্টে যাবে—এ ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

১৭ বছর বয়সী পিটার বিবাহবিচ্ছিন্ন এক দম্পতির ছেলে আর জয়েস স্কুলপালানো তরুণ। এরা দুজনেই উন্নিকৃষ্ণনের কাছে ১০ দিন ছিল। ভারতীয় পরিবারের গঠন তখন তাদের কাছে বেশ স্পষ্ট চেহারায় ধরা পড়ে। উন্নিকৃষ্ণন বলেছেন, 'আমরা তাদের জানিয়েছি বাড়ির নিয়মকানুন সম্বন্ধে। তাদের আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে আমরা রাতের এবং দিনের খাবার খেয়েছি। স্কুলে পাঠানো হয়েছে তাদের।' উন্নিকৃষ্ণনের ছেলে সিদ্ধার্থ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। তার সঙ্গে পিটার আর জয়েস-এর ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল। পিটার এবং জয়েস দেশে ফিরে যোগাযোগ রেখেছে। তারা কাজকর্ম করছে।

পুনের উন্নিকৃষ্ণনের মতো আরও কয়েকজন ভারতীয় অভিভাবকদের কাছে থেকে নিজেদের বদলেছে বৃটিশের কিছু ছেলে। জীবনের স্বাভাবিক পথে তারা ফিরে গেছে। নামের সঙ্গে বেয়াড়া শব্দটা আর যোগ করা যাবে না। তারা শান্তশিষ্ট ভালো ছেলের দলভুক্ত হয়েছে।

তথাকথিত বেয়াড়া ছেলেদের বাবা-মা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এমনভাবে চালাতে বাধ্য হন যার ফলে তাঁরা ঠিকমতো নজর দিতে পারেন না সন্তানের দিকে। শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেদের জীবনধারা বদলানো সম্ভব। আর তাদের স্বপ্ন দেখতে শেখানো দরকার। জীবনটা অনেক বড়ো, অনেক কাজ থাকে। আজকের দিনটাই শেষদিন—এমন ভাবনা যেন প্রশ্রয় না পায়। ভারতীয় অভিভাবকরা এইভাবেই ইংলন্ড থেকে আসা ছেলেদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মন তারাই যাতে ফিরে পায়—সেজন্যে ভারতীয় অভিভাবকরা স্নেহ আর শাসনে এমনভাবে বেঁধে দিচ্ছেন যা থেকে ওই ছেলেরা বঞ্চিত ছিল বহুদিন। হয়তো কেউ কেউ তা পায়নি।

এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নাম ব্যাঙ্গালোরের নলিনী নাগজুনদ্যা। কয়েকটি বৃটিশ তরুণ তাঁর কাছে থেকে সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের পথে চলার সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে গেছে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন তারা ওইভাবে নিজেদের বদলে নিয়ে ভালোছেলের পরিচয় পেয়েছে। যেসব ভারতীয় পরিবার ওইভাবে বৃটিশ ছেলেদের জীবনধারা বদলাবার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা একটি ছেলেকে এক সপ্তাহ রাখার জন্যে এক হাজার পাউন্ড নিচ্ছেন। এর মধ্যেই ধরা থাকে অন্য যাবতীয় খরচ।

অবৈধ সীমকার্ডের রমরমা ব্যবসা মালদা সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বেআইনি ভাবে মোবাইল সিমকার্ডের কারবার রমরমিয়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্থানীয় প্রশাসন। পরিচয়পত্র যাচাই না করেই বই-খাতা, মুদিখানার দোকান থেকে অবাধে সিমকার্ড বিক্রি করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে একজনের পরিচয় পত্র নকল করে অন্যজন সিমকার্ড তুলে নিচ্ছে। সম্প্রতি ইংলিশবাজার থানায় এমনই অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনে এ নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাকারবার করতে দুষ্কৃতীরা অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জোট বেঁধে এই বে-আইনী সিম কার্ডের ব্যবসা শুরু করেছে বলে গোয়েন্দাদের ধারণা। জেলার বাসিন্দাদের অভিযোগ—বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে মালদার ১২টি থানা এলাকাতে অবাধে এই সিম কার্ডের বেআইনী কারবার চলছে। সম্প্রতি কালিয়াচক থেকে তিন লক্ষ নকল টাকা সমেত এক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তার কাছে মোবাইল পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা বেআইনী সিম ব্যবহার করে এরা বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছাত্রদের মাধ্যমে নকল টাকা ভারতে আনছে। জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল।

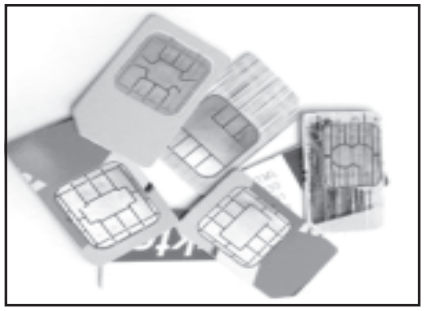

মুসলিম দুষ্কৃতীদের দ্বারা শ্লীলতাহানির প্রতিরোধ মুর্শিদাবাদের সূতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৭ মে মুর্শিদাবাদ জেলার সূতি ২নং ব্লকের (মথেসাইল ২নং অঞ্চলের) বসন্তপুর গ্রামের ছাত্রীরা স্কুল থেকে দুপুরবেলা যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল, সেই সময় কয়েকজন মুসলিম যুবক তাদের উত্যক্ত করে। দু'জন মুসলিম যুবক একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ছাত্রীরা গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামবাসীদের জানালে তারা দোষী একজন যুবকের নামে থানাতে অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু পুলিশ দোষীকে গ্রেপ্তার না করলে ৯ মে সকালে গ্রামবাসী ও আহিরন গালর্স স্কুলের ছাত্রছাত্রী মিলে দোষী যুবকটির বাড়ি (অজগড়পাড়া গ্রামে গিয়ে) চড়াও হয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়, যদিও দোষী যুবকটি পালিয়ে যায়। পুলিশের বিশাল বাহিনী নিয়ে ডি এস পি ঘটনাস্থলে আসলে হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে জনতা শান্ত হয়। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আশেপাশের হিন্দু গ্রামগুলির অভিভাবকরা ছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনকে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা একতাবদ্ধ এবং যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ৭০ শতাংশ মুসলমান হওয়াতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে এবং সেই সুযোগে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার মাঝে মধ্যে ঘটছে। তবে পুলিশ প্রশাসন কড়া হাতে অন্যায়কে দমনে সচেষ্ট হয়েছে। হিন্দুরাও জোটবদ্ধ ভাবে আইনকে সামনে রেখে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এমনিতে বসন্তপুর গ্রামটিতে আর এস এসের বহু সক্রিয় স্বয়ংসেবক রয়েছেন।

সি পি এমের ঢাকী বিমান বসু

সন্ত্রস্ত কেন 'মিডিয়া সন্ত্রাসে'?

রমাপ্রসাদ দত্ত

তিনজনের উপর ভরসা করে দলের মধ্যে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন দল-সংগঠক প্রমোদ দাশগুপ্ত। পরপর তিনটে নাম—অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু। দায়িত্ব মোটামুটি ভাগাভাগি করে দেন প্রমোদবাবু। দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তি'র দায়িত্বে ছিলেন অনিল বিশ্বাস। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক। এবং ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সৎ শিক্ষিত শ্রদ্ধেয় বলা হোত যেসব কমিউনিস্টদের তাঁদের অন্যতম অনিল বিশ্বাস। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথাবার্তার মধ্যেই রয়েছে দু'রকম রূপ। একদিকে তিনি অঙ্ক কষে তোয়াজ করেন একে-ওকে-তাকে। আবার কণামাত্র লোকসানের সম্ভাবনা দেখলে প্যাঁচ কষায় দক্ষ-চূড়ামণি। বিমান বসু উগ্রমস্তিষ্ক। নিজের মতের বিরুদ্ধে কোনও কথা শোনার ধৈর্য নেই। কান দিয়ে দেখার ব্যাপারটা ভালো মতো রপ্ত করা আছে। কোথা গেলে কীভাবে টাকা আমদানি করা যাবে সে অঙ্ক কষায়ও নিপুণ। দল ঠিক রাখার জন্য কাদের তুলতে হবে, কাদের নামাতে হবে, কাকে কোথায় রাখা দরকার, কোথা থেকে কাকে বা কাদের সরানো প্রয়োজন—এসব খেলায় বিপুল ক্ষমতাধর বিমান বসু।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভালোভাবে দেখাশোনা করতে পারবেন এমন ভেবে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল চীনে। আঁতেল-সাজা কমিউনিস্ট আর কেজো কমিউনিস্টে যথেষ্ট তফাত। আঁতেল-কমিউনিস্ট চীন থেকে ফিরলেন প্রমোদ দাশগুপ্তের মরদেহ নিয়ে। প্রমোদবাবুর মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়নি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই সংবাদমাধ্যমের উপর রুষ্ট। তাঁর মতলব বরাবরই থেকেছে, যে সব কাগজ নতজানু হবে না তারা সরকারি বিজ্ঞাপন পাবে না। এবং সরকার সবসময় ঐ কাগজের উপর নজরদারি করবে। জ্যোতিবাবুর আমলে বেশি দক্ষতা দেখিয়ে মহাকরণ থেকে সাংবাদিকদের ভাগাবার জন্যে প্রেস কর্নার ভেঙে দেন। তাঁর মতলব ছিল যেমন বলা হবে সেই অনুযায়ী লিখতে হবে কাগজে। অন্যান্য সংবাদমাধ্যম সেভাবে কাজ করবে। এরপর বুদ্ধদেব বিদায় নেন জ্যোতিবাবুর মন্ত্রিসভা থেকে। জ্যোতিবাবুর মন্ত্রিসভা তাঁর মতে ছিল 'চোরেদের মন্ত্রিসভা'। জ্যোতিবাবুর বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন অনিল-বুদ্ধ-বিমান। বুদ্ধর সরে যাওয়াটা অনিল-বিমানের পছন্দ হয়নি। আর বুদ্ধও বুঝেছিলেন মন্ত্রিসভায় থাকা আর না-থাকার মধ্যে তফাত স্পষ্ট। তিনি পুনঃপ্রবেশের জন্যে তলে তলে তদ্বির চালাচ্ছিলেন। ঠাণ্ডামাথার অনিলের চেষ্টায় জ্যোতি বসু আবার বুদ্ধদেবকে নিয়ে নেন। এরপর অনিল-বিমান-বুদ্ধ ত্রয়ী শক্তির কলকাঠি নাড়া চলতে থাকে জ্যোতি অপসারণের।

সেই চেষ্টায় সাফল্য আসে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

অহংসর্বস্ব হাবভাব দলের মধ্যে আর সরকারি প্রশাসনে অন্যভাবে দেখা যায়। বুদ্ধদেব ভেবে নিচ্ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। আগাগোড়া তাঁকে মদত দিয়েছেন বিমান বসু। দলের দায়িত্ব একসময় অনেকটা সামলেছেন অনিল বিশ্বাস। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বিমান বসু লোকদেখানো কাঁদলেও তিনি বুঝে যান, এবার থেকে আমি আর বুদ্ধ যা করবো তাই-ই চূড়ান্ত। আমাদের উপরে কারও কোনও কথা নেই। একইরকম মনোভাব যাতে সব জায়গায় দলকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়—সেটা তাঁরা দেখেছেন। আর সিপিএম দলের রীতিনীতি—যা বলে দেওয়া হবে তাই-ই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কীর্তন করতে হবে। তার বাইরে কিছু করা যাবে না।

অনেকেই বলেছেন, বিমান বসু হলেন বামফ্রন্টের ওঁছাতম চেয়ারম্যান। অবশ্য ওই ওঁছাত্ব তিনি অর্জন করেছেন অনেক আগেই। দুর্নীতিদুষ্ট, দুর্মুখ এবং দুর্জন—তিনটি বিশেষণ তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। তিন ব্যাপারেই দক্ষতা দেখিয়েছেন। দল যেভাবে নানাসূত্রে টাকা আমদানি করেছে, দলকর্মীরা টাকা নয়ছয় করেছে সব তিনি দলকর্ম বলে চেপে গেছেন। সমর্থন করেছেন। যারা বিরোধিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কটূক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আরও অনেকরকম কথা তাঁর নামে শোনা যায়। সত্যি মিথ্যে যাচাই না করেও বলা যায় তিনি লোক হিসেবে মোটেই সুবিধের নয়। 'মিডিয়া-সন্ত্রাস' নামে একটা কথা তিনি চালু করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে বলে আত্মতৃপ্তি বোধ করছেন। রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে। অন্যান্য নিত্যকৃত্য ঠিকমতো হচ্ছে হয়তো। তিনি ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে 'দেখে নেবো' শব্দ দুটো উচ্চারণ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো। ১৩ মের সকালে গণশক্তির প্রধান খবরে বিমান বসুর কথা রয়েছে। সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম-এর মাইক্রোফোনের সামনে তিনি কথা বলছেন। এক হাত নিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমকে। এবারের ভোটে খুব খারাপ ভূমিকা সেইসব সংবাদমাধ্যমের যারা সিপিএম দলকে তোয়াজ করেনি। বিমান বসুর কথাবার্তার মধ্যে এমন ভাব ছিল, আমরা ক্ষমতায় এলে জব্দ করবো সকলকে। যেমন চেয়েছিলেন একসময় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

সংবাদমাধ্যমকে দমন করার চেষ্টা হয়েছে নানা সময়ে। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে সংবাদশাসন চালিয়েছিলেন। সরকারের অনুমোদন না পেলে কোনও কিছু ছাপা যেত না। বিমান বসুরা সেরকম চেয়েছিলেন। অষ্টম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরলে সিপিএম-এর ভৈরব বাহিনী ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে চারদিকে খেলা দেখাত। বিমান বসু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তলে তলে সেরকম মনোভাব দেখিয়েছিলেন। ছক তৈরি করেছিলেন।

গণতন্ত্রের দুটো বড় স্তম্ভ আদালত এবং সংবাদ মাধ্যম। বিমান বসু কয়েকবার আদালতকে এবং বিচারপতিকে অসম্মান করেছিলেন। বড় দলের নেতা বলে পার পেয়ে গেছেন বিমান। সংবাদমাধ্যমের লোকজন টিট করার কৌশল তাঁর অজানা নয়। তাঁর এক বন্ধু সুবোধ বসু কখন কীভাবে কোন কাগজ ওঠাতে হয় এবং সাংবাদিকদের শায়েস্তা করতে হয়—এ ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দেন ধারাবাহিকভাবে।

বিমান বসুকে সংবাদমাধ্যম ভিলেন হিসেবে দেখেনি। বরং মনে করে এক ভাঁড়। এত বছর ধরে রাজনীতি করছেন, একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রধান পদে আছেন, কিন্তু কথাবার্তা বলার মধ্যে সৌজন্য শিষ্টাচার যেমন নেই, তেমনি নেই বাস্তববোধ। এরকম মানুষই কি এ মুহূর্তে সিপিএম-এর সমর্থকদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ?

ঘাতক কীটনাশকের উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে কেরলে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'অধিক অন্ন উৎপন্ন করো'—এই রাষ্ট্রীয় ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের কৃষকরা জমিতে উৎপাদন বাড়াতে নানাভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। ফসল বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্যা থাকে পোকামাকড়ের আক্রমণের। তাতে ফসলহানি বা হ্রাসের পরিমাণ বাড়ে। তা রুখতে কীটনাশকের ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এমন কীটনাশক ব্যবহারের কথা কৃষিবিজ্ঞানীরা বললেও সেকথা অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। হিতাহিত বিচার না করে ফসল-কীট দমনের জন্যে যেভাবে ক্ষেতে বিষ ছড়ানো হচ্ছে তা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতি করছে মানুষের। বিশেষ করে কৃষক পরিবারে। কেরলের কাসরগড় জেলায় কিছু শিশু জন্মেছে যারা জন্মের পর থেকে অসুস্থ। একই রকম রোগলক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এইসব শিশুর মাথা দেহের তুলনায় বড়ো এবং চোখ বিস্ফারিত। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন ঠিক নয়, গায়ের চামড়া খসখসে, জিভ বেরিয়ে থাকছে, বাড়তি আঙুল হাতে পায়ে। তাদের ফুসফুস ঠিকভাবে কাজ করে না, মলমূত্র ত্যাগের ব্যাপারও স্বাভাবিক নয়, বোধ ও আবেগ প্রকাশে গোলমাল থাকে, স্মৃতিশক্তি কমে যায়, ভারসাম্য থাকে না দৃষ্টিশক্তিতে। তার প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কেও। শারীরিক এবং মানসিক পঙ্গুত্ব ধরা পড়ে। যুবক যুবতীদের মধ্যে যারা এই অসুখে আক্রান্ত তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ওই মারণ অসুখ দেখা দিতে শুরু করে ১৯৮০ সাল থেকে। কাজু চাষের জমিতে বেশি উৎপাদনের জন্যে ঐসময় থেকে তৎপর হয়েছে প্লানটেশন করপোরেশন অফ কেরল। কীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শও তাদের দেওয়া। ১৯৬২ সালে গড়ে ওঠা সংস্থা পার্বত্য অঞ্চলে কাজু চাষের জমিতে বছরে মাত্র তিনবার কীটনাশক ছড়ানোর নির্দেশ ছিল। ১৯৮০ সাল থেকে কাসরগড় জেলার গ্রামবাসীরা দেখেন কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে হেলিকপ্টার থেকে। তখন তাঁরা আদৌ বুঝতেও পারেননি ওই বিষ অজান্তে ঢুকে পড়বে তাঁদের প্রতিরোধ শক্তিতে। এই মারণ-কীটনাশকের নাম এনডোসুলফান। ভারতে ওই কীটনাশকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে কোন অবস্থা হচ্ছে সেদিকে সরকারি লোকজনের নজর নেই। সরকারি লোকজনের যুক্তি, কেরলের একটা জেলায় কীটনাশক ব্যবহারে ওইরকম অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে—অন্যত্র তো নয়। অতএব ওই কীটনাশক সে কারণে নিষিদ্ধ করা যায় না। এনডোসুলফান কীটনাশকের ৭০ শতাংশ ভারত কেনে। সেজন্যে খরচ হয় ১,৩৪০ কোটি টাকা। দেশের জমিতে ব্যাপকভাবে ওই কীটনাশকের ব্যবহার চলেছে।

"ন্যাশনাল হিউমান রাইটস্ কমিশন বলেছে, শুধু এনডোসুলফান নয়, অন্য যেসব রাসায়নিক সার বিপজ্জনক সেগুলোও নিষিদ্ধ করা জরুরি। বলা হয়েছে, রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার না করলে উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।"

এই কীটনাশকের ব্যবহারে ক্ষতি হচ্ছে মানুষের ও গবাদি পশুর---এ যুক্তি জোরালোভাবে পেশ করে এনডোসুলফানকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সুনীতা নারায়ণ বলেছেন, 'এনডোসুলফান কীটনাশকের বদলে এমন কীটনাশক পাওয়া যায় যা ক্ষতিকর নয়, এবং দামও কম। কিন্তু সরকার পরিবেশবিদদের কথায় বধিরের ভূমিকা নেয়।'

কেরলের শুধু কাসরাগড় জেলা নয় অন্যান্য জেলাতেও ওই কীটনাশকের প্রভাব ছড়িয়ে যাচ্ছে। শিশু এবং মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছে। টকসিক ওয়াচ অ্যালিয়াস নামে অলাভজনক সংস্থার চাপে কেরলের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন অনশন ধর্মঘট করেন ওই কীটনাশককে নিষিদ্ধ করার দাবিতে। ন্যাশনাল হিউমান রাইটস্ কমিশন বলেছে, শুধু এনডোসুলফান নয় অন্য যেসব রাসায়নিক সার বিপজ্জনক সেগুলোও নিষিদ্ধ করা জরুরি। বলা হয়েছে, রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার না করলে উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব নয়। ভারত সরকার বিপজ্জনক বলে কৃষিজমিতে ডি ডি টি ছড়ানো নিষিদ্ধ করেছে। একইরকম গরজ থাকা দরকার এনডোসুলফান নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে।

শেষ খবর, কেরল সরকার এনডোসুলফান কারখানা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এরনাকুলামে হিন্দুস্থান ইনসেকটেসাইডস লিমিটেডের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তাদের উৎপন্ন বিতর্কিত এনডোসুলফান কেরলের কাসরগড় জেলার বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং শিশুদের জন্মে ভয়ঙ্কর ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরপ্পা ওই কীটনাশক নিষিদ্ধ করার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ বলেছিলেন, নানাদিক খতিয়ে দেখতে হবে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। তবে এতদিনে টনক কিছুটা নড়েছে। এরনাকুলামের কারখানাকে বলা হয়েছে সাতদিনের মধ্যে উৎপাদন বন্ধ করতে।

ইস্তাহার নয়, মিথ্যাচার

স্বস্তিকাকে পুস্তকাকারে নবরূপে প্রকাশিত করার সিদ্ধান্তকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। এর ফলে স্বস্তিকার গুণগতমান আরও আকর্ষণীয় ও গ্রাহকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পত্রিকায় আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলোর মূল্যবোধ আরও গুরুত্ব পাবে তা বলা যায়। ২৫ এপ্রিল সংখ্যায় ইস্তাহার সম্পর্কিত গূঢ়পুরুষের কলমে প্রতিবেদনটি এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোনও নির্বাচনে ইস্তাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। ইস্তাহারে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রেখে পরবর্তী সময়ে গঠিত সরকারের কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। ইস্তাহারের বিষয়বস্তুও জনগণের জ্ঞাত হওয়া দরকার। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কত অংশ এই ইস্তাহার সম্পর্কে অবহিত থাকেন? তবে ইস্তাহারের গালভরা প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে যতটা অজানা থাকে ততটাই মঙ্গল। কারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায় আর নির্বাচনের পরে জনগণ প্রতারণার শিকার হন। এ রাজ্যে দীর্ঘ বাম শাসনে তো এটাই প্রচলিত রীতি হয়ে আসছে। তাই ইস্তাহার সম্পর্কিত বিষয়ে রাজ্যবাসী ততটা গুরুত্ব দেন না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারেও নানা পরিকল্পনার কথা লেখা হয়েছে। সরকার পরিবর্তন হলেও ইস্তাহারের বিষয়গুলো কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হিসেবে তৃণমূলের মন্ত্রীদের রেলমন্ত্রক ছাড়া উল্লেখযোগ্য অবদান কোথায়? তাহলে তো ইস্তাহারে প্রকাশিত বিষয়গুলো চটকদার বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই তুলনীয়। এটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সামিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেনতেনপ্রকারেণ ভোটে জিতে সরকার গঠন করাই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য তা বলতে দ্বিধা নেই। এরকম নীতি, আদর্শকে পাথেয় করে যে সরকারই গঠিত হোক না কেন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পথে তা অন্তরায় সৃষ্টি হতে বাধ্য। ইস্তাহার যদি মিথ্যাচারে পরিণত হয় তবে তা রাজ্যের পক্ষে নিশ্চয়ই সুখকর হয় না। এখন ইস্তাহার ও মিথ্যাচার প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়ে গেছে। একথা অপ্রিয় হলেও সত্যি।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

লাদেনের অন্ত্যেষ্টি

বিশ্বত্রাস ওসামা বিন লাদেনের হত্যা এবং তাকে সলিল সমাধি নিয়ে নানা মহল থেকে বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আমার মতে আমেরিকা যে পদ্ধতিতে তাকে হত্যা করেছে তা না করে কোনও উপায় ছিল না। লাদেন যখন বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস করে অসখ্য নিরীহ লোককে হত্যা করেছে, তখন এই লাদেন-প্রেমীদের মুখে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি, লাদেনের মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করে আমেরিকা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। কারণ তাকে কোনও দেশের মাটিতে কবর দিলে তার সমাধি মুসলিম মৌলবাদী এবং উগ্রপন্থীদের এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হতো।

এই প্রসঙ্গে তার সামান্য কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—(১) ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটি আক্রমণ করতে এসে এক পাক বৈমানিক ভারতীয় বায়ুসেনার গুলিতে বিমানসহ ভূপতিত হয়ে নিহত হয়। ভারতীয় বায়ুসেনা তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় খড়্গপুরের পীরবাবা নামে মুসলমান কবরখানায় কবর দেয়। তার নামাজ-ই-জানাজায় হাজার হাজার পাক-প্রেমী মুসলমান সমবেত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। এখনও তার ইন্তেকালের (মৃত্যুদিনে) দিনে পাক-প্রেমী মুসলমানরা তার কবরে ফুলমালা দেয় এবং রাত্রে মোমবাতি ও ধূপকাঠি দেয়।

(২) জে. কে. এল. এফ্-এর প্রতিষ্ঠাতা মকবুল ভাটের মৃতদেহ দিল্লীর তিহার জেলের কবর থেকে তুলে নিয়ে কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনার জন্য ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৩ প্রথম সপ্তাহে দুবার বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয় কাশ্মীরে। এখানে উল্লেখ্য যে নরহত্যার দায়ে ১৯৮৪ সালে দিল্লীর তিহার জেলে মকবুলের ফাঁসি হয় এবং জেলের ভেতর তাকে কবর দেওয়া হয়।

(৩) কাশ্মীরে হিজবুল নেতা সইফুল সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়। গত ৪.৪.২০০৩ তারিখে। তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার সময় ২৫ হাজারেরও বেশি পাকপন্থী মুসলমান মৃতদেহ নিয়ে সমাধিস্থলে পৌঁছায়। শোকে আচ্ছন্ন অনেক বৃদ্ধ মহিলা এবং শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে তার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করে এবং আজাদির জন্য মুহুর্মুহু ধ্বনি দিতে থাকে।

(৪) এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় হিটলারের দোসর ইহুদী হত্যার নায়ক আইকম্যানকে যুদ্ধের বহু বৎসর পরে গ্রেপ্তার করে ইজরাইল মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং তার মৃতদেহ মাটিতে কবর না দিয়ে জাহাজে করে সমুদ্র বক্ষে দাহ করিয়ে ছাই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় মাটিতে কবর দিলে সেই স্থান নতুন নাৎসীদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হতো, অতএব আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে অভিনন্দন যোগ্য।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

দু'রকম আইন

সম্প্রতি অসম বিধানসভা ভোটে আমাদের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেননি। অর্থাৎ তিনি তার একটিমাত্র ভোটে যে কোনও ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে না, সেই নীতিতেই বিশ্বাসী। অথচ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনে সকলের অংশগ্রহণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য একটাই—সকলেই যেন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন যে আদপেই কোনও কাজের হয়নি তা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপেই স্পষ্ট।

আরও একটি ঘটনা, সম্প্রতি সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধী কোন ধর্মে বিশ্বাসী এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করেছিলেন জনৈক ভদ্রলোক তথ্য জানার আইনে। এর প্রেক্ষিতে আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছেন এই ধরনের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কেউই বাধ্য নন। একটি প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে—যদি কোনও ভারতীয় নাগরিক তার ধর্ম না জানাতে চান তাহলে জনগণনার কাছে যে তথ্যাবলী জানতে চাওয়া হয় তার মধ্যে 'ধর্ম' জানার জন্য কলামটি কেন থাকে? ভারতবর্ষের আইন যদি সকলের জন্য সমানই হয় তাহলে সোনিয়া ও রাহুল-এর জন্য এই পৃথক ব্যবস্থা কেন? প্রকৃতপক্ষে দেশের উচ্চতর কর্তাব্যক্তিদের এহেন কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে দেশে যেন দুটি সমান্তরাল আইন চলছে। একটি যারা শাসন করবেন তাদের জন্য, আর একটি যারা শাসিত হবে তাদের জন্য। এই ধরনের সমান্তরাল ব্যবস্থা সংবিধানে আছে কিনা তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন।

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

গণতন্ত্র : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

অজিত কুমার বিশ্বাস

জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে। দেশ ৬৩ বৎসর স্বাধীনতা লাভ করেছে, আমি মনে করি গণতন্ত্র নামে ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু স্বার্থপরায়ণ লোক গণতন্ত্রের গান গেয়ে চলেছে। তারা বেশীরভাগই মেকী ধর্মনিরপেক্ষ। আর এই মুষ্টিমেয় কিছু লোক ধর্ম নিরপেক্ষ প্রচার করে দেশকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা বলা খুব কঠিন। আমার মনে হয় গণতন্ত্রের এই পরিভাষা হয় মানুষ বুঝতে পারছে না বা এর সঠিক পরিচালনা হচ্ছে না। যেমন গণতন্ত্র দেশের একটা আইন-যে আইন দ্বারা সবার সমান অধিকার, দেশের সুরক্ষা, আইন প্রণয়ন করা এবং তা সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে সবাইকে মেনে চলার উপযুক্ত করে তোলা, যার দ্বারা দেশ এবং জাতির সঠিক উন্নয়ন ও সেবার সঙ্গে সবার জন্য হৃদয়তার সঙ্গে সম্মান জ্ঞাপন ও সকল নাগরিকের ন্যূনতম অধিকার সুনিশ্চিত করা।

দেশে স্বাধীনতার পূর্বে অনেক দেশপ্রেমিকের কথা আমরা পড়েছি এবং জেনেছি, কিন্তু স্বাধীনতার পরে আর তেমন কোন দেশপ্রেমিক আমরা এখনও পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আজ আমজনতা যাদের নির্বাচিত করে দেবতার আসন দিচ্ছে, ওই সব দেবতারা আমাদের শিয়াল, কুকুর বা অন্যান্য অবহেলিত কীট পতঙ্গ স্বরূপ ব্যবহার করছে। যেমন মাঝে মাঝে রেশন দোকান থেকে যে চাল দেয় তা মানুষের আহারের উপযুক্ত বলে মনে হয় না, কিন্তু তবুও দরিদ্র অসহায় মানুষটিকে ক্ষুধা নিবারণ করতে তাই গ্রহণ করতে হয়। যে কোনও অফিস আদালতে গেলে মনে পড়ে যায় এ আমি কোথায় এলাম। যেমন কোনও সরকারী কাগজপত্রে আপনি সঠিকভাবে পূরণ করেছেন, কিন্তু কখনও দেখা যায় সরকারী কর্মচারী বা অফিসার (আধিকারিক) ভুল করেছেন তবুও তার মাশুল আপনাকে দিতে হবে। ফলস্বরূপ কমপক্ষে সেই কার্যালয়ে কম করেও দশদিন দৌড়াতে হবে তাই শুধু নয় তাদের করুণা, অনুনয় বিনয়সহ চাইতে হবে। এই সব সরকারী কর্মচারী কাদের জন্য! তারা কি সত্যিই জনসাধারণের পরিষেবার কথা চিন্তা করে? তাহলে জনসাধারণকে কেন এত চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তার কোনও সদুত্তর নেই। জন্মের পর থেকে শোনা যাচ্ছে সরকার গরিবী দূর করছে, আজ ৬৩ বৎসর কেটে গেল সত্যিই কি গরীবি দূর হয়েছে? একদিকে সরকারী কর্মচারী আট ঘন্টার বিনিময়ে মাসে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা আয় করছেন, অন্যদিকে আর একটি দিন মজদুর দিনে ১৫০ টাকা আয় করছে, তার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের 'বিনিময়ে'। হয়তো সে মাসের সব দিন কাজ পায় না। তাহলে কি 'সরকার' এদের জন্য কি আলাদা হাট বাজারের ব্যবস্থা করেছেন? সমাজবিরোধী-লোকের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এর জন্য দায়ী কে? সেই সমাজবিরোধী কোথা থেকে জন্মায়, সেটা সাধারণ মানুষ জানে, কিন্তু বলতে সাহস পায় না। আজ গণতন্ত্র দেশের নেতা বা আমলাকে পাহারা দিতে দেশের তিরিশ শতাংশ পুলিশ মোতায়েন করতে হচ্ছে, তাহলে আমজনতার কি হবে? আমার মনে হয় যেখানে গণতন্ত্র আছে সেখানে দেশের অভ্যন্তরে নেতা, আমলাদের জন্য এত কঠোর নিরাপত্তার দরকার পড়ে কি? টেলিভিশন বা খবরের কাগজ দেখলে মনে হয়, এক ভারতবাসী অন্যের শত্রু। পার্টি বা রাজনৈতিক দল বলতে তো প্রত্যেকটি নাগরিকের মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, সেখানে কেন থাকবে এত মারামারি বা হিংসা এবং শত্রুতা? ভোটের আগে বাড়িতে বিভিন্ন স্তরের নেতা নেত্রীরা আসেন, আর কত গালভরা সাহায্য এবং প্রতিশ্রুতির কথা বলেন। আর তারপর শপথ নেবেন আর বলবেন, সত্য, পবিত্র, সুশাসন ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব, সকলের সেবা করব ইত্যাদি।

একটা নমুনা :—

পুলিশের হাতে বন্দুক দিয়াছি/ছুঁড়তে করেছি মানা/সেই ফাঁকেতে দুষ্কৃতীরা/সমাজ করছে কানা।

এবার আসা যাক ইলেকট্রনিকস্ মিডিয়ার ভূমিকায়, গণতান্ত্রিক দেশে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। মিডিয়ার সূত্রে বা সাহায্যে দেশ এবং বিদেশের নিবিড় সম্পর্ক আদানপ্রদান সর্ব কাজের বিস্তারিত আমরা জানতে পারি। সেই মিডিয়া নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করলে সারা পৃথিবী জানতে পারবে সঠিক তথ্য। সকালে ঘুম থেকে জাগরণের পর সমগ্র ভারতবাসী কাগজ নিয়ে প্রাতঃরাশ সারে সেই সঙ্গে কেউ কেউ টিভি দেখে বা রেডিও শোনে। এর মাধ্যমে দেশে বা বিদেশে কি ঘটছে তা জানবার বা বোঝবার জন্য। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ খবর বিভিন্ন রকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা বা লেখা হয়। ওই সংবাদের কোনও সারমর্ম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বা সাধারণ লোক বুঝতে পারছে না। দেশের যত নোংরা সংবাদ আছে তাকে তুলে ধরা তাদের কাজ। দেশের যত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে তাদের কথা তুলে ধরা হয় না। যে সব বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় সেটা নিয়ে ভাববার বিষয়। কারণ ওই অ্যাড আমাদের অনুকূল সুষ্ঠু সমাজ গড়ার পথে বাধা বলে মনে হয়। ওই সকল বিজ্ঞাপন মনে হয় দেশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা টিভি, রেডিও শুনি বা দেখি মনোরঞ্জনের জন্য। সেই মনোরঞ্জন যদি সমাজের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা প্রদর্শনের প্রয়োজন কি? যেমন টিভি বা সিনেমার পর্দায় দেখে কিছু চুরি, ডাকাতি খুন, ধর্ষণ। তার অনুকরণ করা হচ্ছে তাহলে এর প্রয়োজন আছে কি? নেই! এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনারাও করবেন।

আমরা ভারতবাসী অনেক রক্ত দিয়ে ইংরেজদের তাড়িয়েছি, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দেশের উন্নতি কতটা হয়েছে তা বলা ভীষণ কঠিন। সেখানে দেখা যাচ্ছে পুরাতন সভ্যতাকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের সভ্যতা বা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরছি। এটা ভারতবাসী হিসাবে কাম্য নয়। বিপ্লবী বন্ধুগণ এক রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ সেই সমস্ত বিপ্লবীদের নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের তাড়িয়েছেন। আজ দেশের সংস্কৃতি বিক্রিত ও বিকৃত হচ্ছে ওই সকল ইংরেজ সাহেবদের কাছে। নকল করছি তাদের, তাহলে আমাদের আর কি-বা রইল? আজ এই ভারতমাতাকে কেউ রক্ষা করবার কে আছে?

আমি মনে করি আজ ছাত্র যুব সমাজ জেগে উঠলে তবেই দেশ বা জাতির রক্ষা হওয়া সম্ভব। আমাদের ভারতমাতার কাছে কোন কিছুর অভাব নেই, পৃথিবী যত প্রকার দ্রব্য তা সমস্ত কিছুই ভারতবর্ষে মজুত আছে। এটা দেবভূমি, মহাপুরুষদের ভূমি অগণিত মহাপুরুষ এখানে জন্মেছেন, তাঁদের বাণী কথামৃত উপদেশ আমাদের সর্বদা স্মরণে রেখে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের সভ্যতা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠুক। আমাদের পশ্চিমী কিছু দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি নকল করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু পেয়েছি বলে মনে হয় না। বরং কিছু হারিয়েছি। যেমন ভারতীয় সভ্যতার প্রতিকূল পরিবেশ যা সমাজকে বিকৃত করা ছাড়া আর কি বা পেয়েছি। সামান্য আলোচনান্তে— জয় হিন্দ জয় ভারত।

ঐতিহাসিক দুর্গ কালীঞ্জর

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক কালীঞ্জর দুর্গ ভারতের অজেয় ও শক্তিশালী দুর্গগুলির মধ্যে অন্যতম। দুর্গম বিন্ধ্যপর্বত শ্রেণীর ওপর নির্মিত এই দুর্গের রণকৌশলগত অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতায় প্রায় ৩০-৩৫ মিটার এই দুর্গটি মূলত বেলেপাথর ও গ্রানাইট শিলা দিয়ে তৈরি। শক্তিশালী ছিদ্রযুক্ত প্রাচীর, সুদৃঢ় কপাট ও ভৌগোলিক অবস্থানের ফলেই কালীঞ্জর শত্রু সৈন্যদলের আক্রমণে অধিকাংশ সময়েই অজেয় ছিল। দুর্গের শিল্পকলা চান্দেল রাজপুত শাসনের দক্ষ শিল্পনৈপুণ্যর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্গের সাতটি সুদৃঢ় প্রবেশদ্বার—আলমদ্বার, গণেশদ্বার, হনুমানদ্বার ইত্যাদি, যেগুলি দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। ''কালজয়ী'' নীলকণ্ঠধারী মহাদেবের তপোস্থল কালীঞ্জর যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ হিসেবে চিহ্নিত। ঐতিহাসিকদের মতে রাজপুত গুর্জর রাজারা প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী ধরে গড়ে তোলেন এই দুর্গ ও নীলকণ্ঠ মহাদেবের ভব্য মন্দির। কিছুকাল প্রতিহারদের অধিকৃত থাকার পর এটি চান্দেলদের অধিকারে আসে। সপ্তম শত শতাব্দীতে চান্দেলরাজ কেদারবর্মন দ্বারা বর্তমান দুর্গটির প্রতিষ্ঠা হয়। গম্ভীর পরিবেশে অবস্থিত ৫ ফিট্ দীর্ঘ নীলকণ্ঠ মহাদেবের লিঙ্গ এবং অদূরেই কষ্টিপাথরের ভৈরব ও পার্বতীর মূর্তি মনকে অধ্যাত্ম রাজ্যে উন্নীত করে। দুর্গ চত্বরটি অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ যা বিবিধ প্রাচীন সংস্কৃতিগুলোর সমন্বয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ত্রিদেব, নটরাজ, অনন্তশয্যায় বিষ্ণু, ইন্দ্রাণী, কামদেব ও বেঙ্কটবিহারী মন্দির ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় শিল্পকলা থেকে অনুমিত হয় যে চান্দেল রাজ্যের শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দা ছিলেন। প্রস্তরে খোদিত দেবী কালী, চণ্ডীকা, শিব, পার্বতী ও নন্দী ইত্যাদি তৎকালীন শিল্পদক্ষতার নিদর্শন হয়ে কালের বিনাশ উপেক্ষা করে আজও বিদ্যমান।

চান্দেল রাজপুতরা কালীঞ্জরকে কেন্দ্র করে তাদের শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। গজনীর সুলতান মহমুদের আক্রমণ ছিল কালীঞ্জরের ওপর প্রথম বিদেশী আক্রমণ। ১০১৯ এবং ১০২২ সালে দুবার তিনি কালীঞ্জর আক্রমণ করলেও দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করে সেটিকে লুণ্ঠনে অসমর্থ হন। কালীঞ্জরপতি বীর বিদ্যাধর প্রবল পরাক্রমে তাঁর আক্রমণের প্রতিরোধ করেন। মহমুদ তাঁকে ইসলাম গ্রহণ অথবা বার্ষিক কর দেওয়ার আদেশ পাঠান, কিন্তু বীর চান্দেলরাজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে উভয়পক্ষই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান স্বীকার করে নেয়। ব্যর্থ হয় মাহমুদের বিশাল সৈন্যসম্ভারসহ কালীঞ্জর অভিযান। ১০৯০ খৃস্টাব্দে চান্দেলরাজ কীর্তিবর্মন পাঞ্জাবের শাসক মহমুদের কালীঞ্জর আক্রমণ বীর বিক্রমে পর্যদুস্ত করেন। ১২০২ খৃস্টাব্দে কতুবুদ্দিন আইবক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহকারে কালীঞ্জর অবরোধ করলে চান্দেলরাজ পরমার্দীদেব বেশ কিছুদিন তার প্রতিরোধ করেন। কিন্তু রসদের অভাবে তিনি কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হলেও সন্ধি চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। চান্দেলসেনাপতি বীর অজয়দেব চুক্তি অগ্রাহ্য করে নবোদ্যমে যুদ্ধ জারী রাখেন। দুর্গে জলের অভাব দেখা দিলে অজয়দেব এই অসম যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন ও ব্যথিত হৃদয়ে দুর্গ ত্যাগ করেন। প্রথমবার বিদেশী ও বিধর্মীর হস্তে পদানত ও লুণ্ঠিত হয় কালীঞ্জর। কিন্তু শীঘ্রই পরমার্দীদেবের পুত্র ত্রৈলোক্যবর্মন প্রবল বিক্রমে মুসলমান বাহিনীকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত করে কালীঞ্জর পুনরায় অধিকার করেন। এরপর বেশ কয়েকবার মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয়েও কালীঞ্জর অপরাজিত থাকে।

১৫২৯ খৃস্টাব্দে কালীঞ্জরপতি কীর্তিরায়ের ঘরে প্রবল প্রতাপী বীরাঙ্গনা রাণী দুর্গাবতীর জন্মে ধন্য হয় কালীঞ্জরের ভূমি। দুর্গাবতীর বাল্য ও কৈশোরের বীরোচিত কার্যকলাপে কালীঞ্জরের শৌর্য ও বীর্যের ইতিহাস পূর্ণতা পায়। ১৫৪৪ সালে শেরশাহের নেতৃত্বে বিশাল আফগান ফৌজ কালীঞ্জর আক্রমণ করে। এক বছর পর্যন্ত চান্দেল-নরেশ কীর্তিরায়ের নেতৃত্বে বীর বুন্দেল রাজপুতগণ আফগান আক্রমণ পর্যদুস্ত করতে থাকে। পাঠানরা সুড়ঙ্গে বারুদ বিস্ফোরণ করে কেল্লার প্রাচীর ধসিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে কীর্তিরায় ও তার বাহিনী বীরত্বের সহিত মোকাবিলা করতে করতে যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হয়, কালীঞ্জর পাঠানদের দখলে গেলেও এই যুদ্ধে শেরশাহের মৃত্যু হয়। ১৫৬৯ সালে আকবর কালীঞ্জরকে দিল্লীর শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মহাবলী ছত্রসাল বুন্দেল পুনঃ কালীঞ্জরে হিন্দু আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কালীঞ্জরকে অন্যতম কেন্দ্র করে বুন্দেলখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন শক্তিশালী স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। ১৮১২ সালে কালীঞ্জর বৃটিশবাহিনী দ্বারা দীর্ঘ যুদ্ধের পর অধিকৃত হয়। তারা দুর্গে প্রচুর ভাঙচুর ও লুঠপাঠ চালায়, যার চিহ্ন আজও দুর্গচত্বরে বর্তমান। ভারতের এই ঐতিহাসিক দুর্গকে বিদেশী আক্রমণকারীরা কখনওই দীর্ঘদিন নিজ অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়নি। চির স্বাধীনতার অগ্রদূত এবং চান্দেল রাজপুতদের শৌর্য-বীর্য ও স্থাপত্যশৈলীর সাক্ষী কালীঞ্জর যেন আজও অপরাজিত।

পণ্ডিচেরী

তরুণ কুমার পণ্ডিত

উত্তরবঙ্গ থেকে ১৪ জন সঙ্ঘের কার্যকর্তা ৪ মার্চ গৌহাটি-চেন্নাই এর্নাকুলাম এক্সপ্রেসে উঠে বসেছিলাম। কর্নাটকের পুত্তুরে একটি বৈঠকে যোগ দিতেই এই যাত্রা। তবে বৈঠকের বেশ কয়েকদিন আগে রওনা হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়—এক ঢিলে দুই পাখি মারা অর্থাৎ বৈঠক এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু স্থান ভ্রমণ। দুই রাত্রি ও পুরো একদিন ট্রেনে কাটিয়ে আমরা ৬ মার্চ সকাল ৭টাতে যখন চেন্নাই স্টেশনে পৌঁছালাম, তার আগেই কয়েকজন স্বয়ংসেবক আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ২০ মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে করে আমাদের চেন্নাইয়ের সঙ্ঘ কার্যালয় 'শক্তি'-তে তারা পৌঁছে দিল। সেখানে স্নানাদি সেরে সেদিনের গন্তব্যস্থল

যোগী অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পন্ডিচেরী যাওয়ার জন্য ভাড়া করা একটি সুমোতে উঠে বসলাম। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের ধার ঘেঁষে ছোট্ট রাজ্য পন্ডিচেরীতে গিয়ে পৌঁছালাম। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, দক্ষিণ ভারতের রাস্তাঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থা খুব উন্নত হওয়াতে এতদূর রাস্তা পেরিয়ে এলাম, অথচ কোনও ক্লান্তি অনুভব করলাম না। আমরা যখন সারি সারি নারকেল ও তাল গাছের সারি ভেদ করে সমুদ্র তীরবর্তী পন্ডিচেরীতে পৌঁছালাম তখন দুপুর হয়ে গেছে।

শহরের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলা বঙ্গোপসাগরের আকর্ষণ ততক্ষণে অনুভব করছি। ইতিমধ্যে ড্রাইভার এসে বলল, এখন শ্রী অরবিন্দের আশ্রম বন্ধ রয়েছে, বিকাল ৩টাতে দর্শনার্থীদের জন্য খুলবে। আমরা পায়ে পায়ে বাঁধানো চওড়া ফুটপাত দিয়ে সাগরের পাড়ে এসে পড়েছি। বহু দেশী বিদেশী দর্শনার্থীদের সমাবেশ। সমুদ্রের পাশেই রয়েছে মনোলিথিক পিলারের ওপর গান্ধীজীর বিশাল ১৪ ফুট উঁচু মূর্তি। তার সামনেই জওহরলাল নেহরুর স্ট্যাচু। আর রয়েছে আকাশচুম্বি 'লাইট হাউস'। একটু এগিয়ে লক্ষ্য করলাম, একটি জেটির ওপরে সারাক্ষণ প্রবল আক্রোশে সবাইকে আকর্ষণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রলয়ঙ্করী ঢেউ। সেই দৃশ্য এতই মনোরম যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখলেও শরীর ও মনে ক্লান্তি আসে না।

এতক্ষণে খিদেয় সকলের পেটে ইঁদুরে ডন মারতে শুরু করেছে। হোটেলের খোঁজে সকলেই চলল। হঠাৎ প্রবীরদার নজরে এল বাংলাতে লেখা 'মাছ ভাত পাওয়া যায়'। সকলের কী উৎসাহ। কিন্তু হোটেলে গিয়ে দেখা গেল কিছুই নেই। অগত্যা সকলে মিলে কার্তিক হোটেলে মিল সিস্টমে ৭০ টাকা প্রতি প্লেট হিসাবে ঢুকে পড়লাম। প্রথমে ভেবেছিলাম এত টাকা দিয়ে কতটুকুই বা খেতে পাব! কিন্তু ভিতরে ঢুকে যে ভুরিভোজের আয়োজন পেলাম তা জানাতে চাই। ভেজ বিরিয়ানী থেকে পনিরের তরকারী সহ তিন রকমের তরকারী, পুরি, পায়েস, দই, তিন রকমের মিষ্টি, পাঁপড়, চাটনী, ভাত এবং শেষে মিষ্টি পান। দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য যে এত প্রকার হতে পারে কারও জানা ছিল না। যাই হোক, আমরা এবার পন্ডিচেরীর প্রধান আকর্ষণ 'শ্রী অরবিন্দ আশ্রম' দেখার জন্য এসে পৌঁছালাম। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়ির মধ্যে একটি স্থানে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই পন্ডিচেরী রাজ্য ২৫০ বছর ফরাসী শাসনাধীন থাকার পর ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৭৩৯ সালে ফরাসী স্থপতি ফ্রন্সিস মার্টিনের হাতে গড়ে ওঠে পুডুচেরী—Puducherry যার তামিল ভাষায় অর্থ দাঁড়ায় নতুন শহর। পুডু অর্থে নতুন এবং 'চেরী' অর্থে শহর। পুডুচেরীই পরবর্তীতে পন্ডিচেরীতে পরিণত হয়েছে। যাই হোক, আমরা শ্রী অরবিন্দের ও শ্রীমার সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে সকলেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছি। বহু বিদেশী ভক্তকেও আমাদের সঙ্গে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এক সময়ে সকলেই সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করলাম। সকলেই নিস্তব্ধ, নির্বাক। এক জায়গাতে ফুল রয়েছে। সেখান থেকে প্রত্যেকে অল্প অল্প ফুল নিয়ে দুইটি সমাধিতে অর্ঘ নিবেদন করলাম। প্রণাম করলাম ভক্তিভরে। কী অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ! এই সেই অরবিন্দ যিনি একাধারে মহাবিপ্লবী, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি—কারাগারে বন্দী অবস্থায় যাঁর দিব্যজ্ঞান লাভ এবং পরবর্তীতে এই পন্ডিচেরীতেই ৪০ বছর ধরে যোগাভ্যাস ও সাধনায় ডুবে থাকা জীবনের অবসান। অপরদিকে শ্রী অরবিন্দের সাধক জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন শ্রীমা মীরা রিসার। তিনিও এখানে দেহত্যাগ করেছেন। আশ্রম থেকে বেরিয়ে আশ্রমের বুকস্টল থেকে কিছু ছবি ও পুস্তক কিনে আবার গাড়িতে এসে বসলাম। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে পন্ডিচেরী দর্শনের কিছু বাকী থাকল। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ২৬০০০ একর জায়গা জুড়ে শ্রী অরবিন্দের আদর্শে তৈরি 'অরোভিল' নগরী দেখা হলো না। ফেরার তাড়া, রাত্রি ৮টা ২৫ মিনিটের মধ্যে চেন্নাই স্টেশনে পৌঁছাতে হবে।

কেরিয়ারের ঠিকঠিকানা

পেশা শিক্ষার নানা দিক

চাকরির বাজার ধরতে বা নিজের যোগ্যতা আরও মূল্যবান করে তুলতে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নেওয়া যেতেই পারে। তবে তা যেন নিজের অধীত পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এই মুহূর্তে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে এমন কয়েকটি পাঠ্যক্রমের হদিশ দিচ্ছেন ***নীল উপাধ্যায়।***

১. ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডি এড)

২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হবে জুলাই মাসে। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার জন্য এই প্রশিক্ষণ জরুরি। কোর্সের মেয়াদ দু'বছর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। ১ জুলাই ২০১১ তারিখে বয়স হতে হবে ২৮—৩৫ বছরের মধ্যে। বয়স ও নম্বরের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মমাফিক ছাড় পাবেন ST SC, OBC ও প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা। ভর্তির ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। সোনারগাঁও বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউট ফর প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং, নরেন্দ্রপুর স্টেশন রোড, তেঘরিয়া, সোনারপুর, কলকাতা-১৫০। জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩১ মে। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমায় রাজ্যের অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানেও ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন কোর্সটি করানো হচ্ছে। কোর্সের আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ দিন ১৫ জুন। আগ্রহী প্রার্থীরা www.wbsod.gov.in বা www.banglarmukh.gov.in দেখতে পারেন।

২. ভেটারিনারি সায়েন্স

বেলগাছিয়া ইউনিভার্সিটি অব্ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড্ ফিশারি সায়েন্সেস্ প্রতিষ্ঠানে ভেটারিনারি সায়েন্স অ্যান্ড্ অ্যানিম্যাল হাস্‌বেন্ড্রি নামের ৫ বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও বায়োলজি থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের এক স্বতন্ত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে এখানে ভর্তি করা হয়। আসনসংখ্যা ৬০। ১৫ শতাংশ সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। BVSc করার পর MVSc করা যায়। ১৭টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পড়া যায় : লাইভস্টক প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, অ্যানিম্যাল জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং, অ্যানিম্যাল নিউটিশন ইত্যাদি। মাস্টার্স ডিগ্রি করার পর গবেষণা এবং অধ্যাপনার সুযোগ আছে।

রঙ্গকৌতুক

রোগী : আমি বাড়ির চাবিটা গিলে ফেলেছি।
ডাক্তার : সে কি, কবে?
রোগী : মাস তিনেক হবে।
ডাক্তার : এতদিন কী করছিলেন?
রোগী : স্পেয়ার চাবি দিয়ে চালাচ্ছিলাম। আজ সেটাও পাচ্ছি না।

***

স্ত্রী : হ্যাঁ গো, তুমি নাকি এই বুড়ো বয়সে কোন্ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছ?
স্বামী : কী করব, ডাক্তার যে সিগারেট ছাড়তে প্রেম করার পরামর্শ দিয়েছে।

***

প্রথম জন : আমরা তো লাফিং বুদ্ধর সঙ্গে পরিচিত। বল্‌তো এর বিপরীত কী হতে পারে?
দ্বিতীয় জন : কেন, গৌতম গম্ভীর!

—নীলাদ্রি

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

ভোটের পর জল ফস্ করে না

'ভোটের পর জল ফস্ করে না' গল্পটি হয়তো অনেকের জানা। ডায়মন্ডহারবার ক্যানিং লাইনে স্যাকারিন ও গ্যাস পোরা জলের বোতল পাওয়া যায়। ছিপি খুললেই ফস্ করে একটা শব্দ হয়। এবার দ্বিতীয় দফা বিধানসভা ভোটে এক ভোটারকে ভোট দিতে নিয়ে যাবার পথে ওই ফস্‌জল খাওয়ানো হয়েছিল। ভোটপর্ব শেষে রোদে তাতা ভোটারটি বলল, 'জল তেষ্টা পেয়েছে।' ওকে টিউবওয়েল দেখিয়ে দিলে ভোটার বলে, 'টিউবওয়েলের জল নয়, ফস্ করা জল চাই।' ভোট প্রার্থীর লোক বলেছিল 'ভোটের আগেই জল ফস্ করে, ভোট হয়ে গেলে আর ফস্ করে না।'

ফোলে আর্টিস্ট

হলিউডের সিনেমা বা হালের হিন্দি সিনেমার শেষে টাইটেলে কলাকুশলীদের নাম যেখানে দেখানো হয়, সেখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কিছু কুশলীদের বলা হয় ফোলে আর্টিস্ট (Foley Artist)। কারা এই ফোলে আর্টিস্ট, কী কাজ তাঁদের, কেনই বা এ নাম? এঁরা নানা ধরনের এফেক্ট সাউন্ড তৈরি করেন। সাউন্ড এফেক্টের প্রবর্তক হলিউড সাউন্ড রেকর্ডিস্ট জ্যাক ফোলের নামে এঁদের বলে ফোলে আর্টিস্ট।

বিশ্ব রেকর্ডের নভশ্চর

১৯৬১। মহাকাশ সফর সেরে প্রথম নভশ্চর য়ুরি গ্যাগারিন পৃথিবীতে ফিরলেন। কিন্তু ভুল ঠিকানায়—যেখানে নামার কথা ছিল তার থেকে দুশো মাইল দূরে, একটি নির্জন স্থানে। কেন এই হাল? হিসেবের ভুলে হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর এই বিভ্রাটের কাহিনী সম্পূর্ণ চেপে রাখা হয়েছিল। পরন্তু গ্যাগারিন মহাকাশ যানে নামেননি, আকাশ থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এসব তথ্য জানাজানি হলে 'বিশ্ব রেকর্ড'-এর দাবিটা টিকত না, সুপার পাওয়ার-এর মহিমায় টোল পড়ত। অতএব—ইতি গজ। পঞ্চাশ বছর পরে সত্য ফাঁস হয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য পৃথিবী বদলে গিয়েছে। সেই গ্যাগারিনও নেই, সেই মস্কোও নেই।

মগজচর্চা

১। ভারতের কোথায় আছে তুলিহাল (TULIHAL) নামে বিমান বন্দরটি?
২। কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য কে অজগর সাপ সেজে তাঁর যাতায়াতের পথে বসেছিল?
৩। জাপান ও চীনের মুদ্রার নাম যথাক্রমে ইয়েন (Yer) ও ইউয়ান (yuan)/এই শব্দ দু'টির মূল অর্থ কী?
৪। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মোট ক'টা ছয় মেরেছিলেন?
৫। কোন অনলাইনে এনসাইক্লোপিডিয়ায় এখন ২৭টা ভাষায় এক কোটি তিরিশ লক্ষের বেশি নিবন্ধ আছে?

—নীলাদ্রি

উত্তর : ১। ইম্ফল, মণিপুরে ২। অঘাসুর ৩। গোলাকার বস্তু ৪। ১৫টা ৫। উইকিপিডিয়ায়

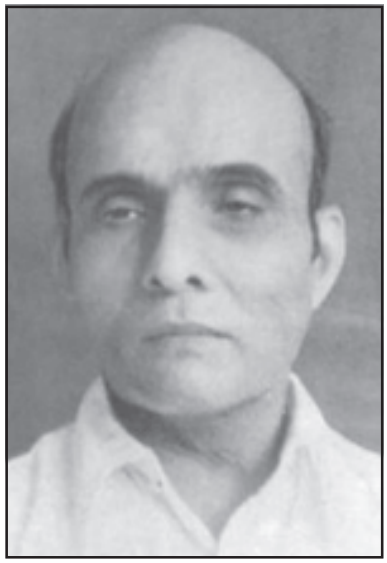

সাভারকরের ১২৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

ভারতীয় রাজনীতিতে উজ্জ্বল মনীষা

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

শ্যামলেশ দাস

ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দৈব সত্তার সমন্বিত রূপে বিশ্বাসী মতবাদকে ত্রিত্ববাদ বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনেও অনুরূপ এক মতবাদ আছে। তাকে বলা হয় 'ট্রিনিটিজম'। ভারতের রাজনীতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশের জাতীয় নেতৃত্বে আগত ও সংগ্রামরত তিন উজ্জ্বল রত্নের সন্ধান আমরা পেয়েছি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তারা শুধু অত্যন্ত কম আলোচিতই নন, তাঁরা রীতিমতো উপেক্ষিত এবং তাঁদের অবদান মুছে দিয়ে উত্তর প্রজন্মকে তাঁদের সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা স্বাধীনোত্তর ভারতের সরকারী নীতিতে এমনকী বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানিক মহলেও পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় রাজনীতির এই উজ্জ্বল ত্রিরত্ন হলেন : নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বীর সাভারকর এবং ডাঃ হেডগেওয়ার। এদের মধ্যে বীর সাভারকর স্বাধীনতা লাভের পরেও প্রায় দুই দশক জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ও জাতীয় দলগুলির কাছে অত্যন্ত অবহেলিত ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করি। ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরী অবস্থা চলাকালীন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটি কালাধারে (Time Capsule) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মিথ্যা ইতিহাস লিখে তাকে গভীর ভূগর্ভে প্রোথিত করেন যাতে উত্তরকালে কোনওদিন ভূগর্ভ খননের ফলে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হলে মানুষ জানতে পারবে যে সাভারকর থেকে সুভাষচন্দ্র কেউ নন—তাদের নামও ভাবীকাল জানতে পারবে না। কালাধারে ভূগর্ভে প্রোথিত এই মিথ্যা ইতিহাসে লেখা হয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও অর্জনের একচ্ছত্র ঠিকাদার ছিলেন নেহরু ও গান্ধী পরিবার। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতার বিপুল সমর্থনে বহুদলের সমন্বয়ে গঠিত জনতা দলের সরকার এই কালাধার ভূগর্ভ থেকে তুলে এই মিথ্যা ইতিহাসের চোথাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। এহ বাহ্য আগে কহ আর। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া'তে সিপাহী বিদ্রোহকে বলেছেন Feudal outburst অর্থাৎ হতাশাগ্রস্ত সামন্ত প্রভু ও রাজন্যবর্গের বিদ্রোহ। এই বইতেই তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেছেন Misguided Patriot অর্থাৎ বিপথগামী দেশসেবক। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বদেশ চেতনাকে কোনও গুরুত্ব দেননি। তাই ১৯৫৭ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্ণ হয় তখন নেহরু ভারত সরকারের তরফে সিপাহী বিদ্রোহের মূল্যায়নভিত্তিক জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। বীর সাভারকর তখন জীবিত। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত ইতিহাস রচয়িতা এই মানুষটিকে নেহরু আহ্বান জানাননি বা তাঁর সঙ্গে কোনও পরামর্শও করেননি। ইতিহাস রচনায় নেহরু তাঁর মতবাদকেই চাপানোর চেষ্টা করেন। প্রতিবাদে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি স্বাধীনভাবে সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করে স্বতন্ত্র এক ইতিহাস রচনা করান। নেহরু তখন তাঁর বশংবদ ও ভাড়াটে ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদকে দিয়ে তাঁর মতকে প্রাধান্য দিয়েই সিপাহী বিদ্রোহের এক সরকারী ইতিহাস রচনা করেন। তারপরে স্বাধীন ভারতে নেহরু সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করতেন তা সর্বজনবিদিত। একটা জাতির জীবনে আগত প্রকৃত বীর নায়কদের যথাযোগ্য সম্মান না দিলে এবং তাদের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন না করলে সমগ্র জাতিরই ক্ষতি হয়। এই অশুভ প্রবণতাকে সংশোধনের প্রয়াসের নজির ২০১০-এর ৭ মার্চ তারিখে প্রকাশিত একটি বই। বইটির শিরোনাম : "**বীর সাভারকর, ডাঃ হেডগেওয়ার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্মরণে**"। বইটির প্রকাশক—জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ। বাংলাভাষায় ১৩টি ও ইংরাজী ভাষায় ১৪টি মোট ২৭টি সুলিখিত প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই তিন বীর নায়ককে বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক গবেষণার সাহায্যে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই স্বনামধন্য সারস্বত গবেষক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদরূপে সুপরিচিত। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত বহু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি সত্যিই প্রশংসনীয়। এই বইতে পরিবেশিত বেশ কিছু তথ্য অজানা না হলেও অত্যন্ত কম আলোচিত হয়েছে। যেমন বীর সাভারকরের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক। সকলেই জানেন যে ১৯৪০ সালে (দেশত্যাগ করার কিছুদিন আগে) সুভাষচন্দ্র সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিদেশে গিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করে বৃটিশ ভারতে সামরিক অভিযানের পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্র অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনাপর্ব থেকেই অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগে দেশের বাইরের কোনও বৃটিশ বিরোধী শক্তির সাহায্যে ভারতে সামরিক অভিঘাতের (Military thrust) পরিকল্পনা করতেন। এর জন্য চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগও রক্ষা করতেন। বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ সুভাষচন্দ্রের এই যোগাযোগের (clandestine link) খবর রাখত। যার ফলে সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়ে বিনাবিচারে কয়েকবৎসর আটক ছিলেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে সুভাষচন্দ্রকে সাভারকরের পরামর্শের অবদান অনস্বীকার্য। আরেকটি মূল্যবান তথ্য বইটিতে পাওয়া গেল। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপান থেকে নিয়মিত বীর সাভারকরকে চিঠি দিতেন। জাপান থেকে ভারতে অবস্থিত এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মারফৎ গোপনে সাভারকরের কাছে চিঠি আসত। গোপন পত্রযোগে নানা বিষয়ে তারা আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময় করতেন।

বীর সাভারকরের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। সাভারকর স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রও অধ্যাপক ওটেনকে সুমচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সী

কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। সাভারকর রাজনীতি ছেড়ে দেবার জন্য মুচলেকা না দেওয়ায় ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ব্যারিস্টারের সনদ লাভ করেননি। সুভাষচন্দ্র আই সি এস্ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েও চাকুরীতে যোগ দেননি। চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সাভারকর সিপাহী বিদ্রোহের উপর একটি বিস্ফোরক বই লিখেছিলেন। তিনিই সিপাই বিদ্রোহের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকার। বইটি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। সুভাষের ''ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'' বইটিও বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বইটিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর ভ্রান্ত নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা ছিল। কিন্তু বই দুটির জনপ্রিয়তা ও গোপন প্রচার রুদ্ধ করা যায়নি। বই দুটি আজও জনসাধারণ পড়বার সুযোগ পায়। সাভারকরকে কলঙ্কিত করার জন্য তাঁকে গান্ধীহত্যা মামলায় জড়িয়েও নেহরু সরকার সফল হয়নি। সাভারকর বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। বইটিতে একটি নতুন ও চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেল। গান্ধী হত্যা মামলা চলার সময় সাভারকরের আইনজীবী আন্নাসাহেব বোপতকারের সঙ্গে ভারতের আইনমন্ত্রী ডঃ বি আর আম্বেদকরের সাক্ষাতের এক বিস্ফোরক তথ্য বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। (পৃঃ ১৫৭-১৫৮) তাঁদের সংলাপের একটি অংশ বোপতকারের বয়ানেই উদ্ধৃত করি। ডঃ বি আর আম্বেদকর তাঁকে বলেছিলেন : "There is no charge against your aqaitist (that is concocted) Members of the Cabinet were of the opinion that Savarkar should not be implicated on a mere doubt. But because of the insistence of a top-ranking leader (this indirect reference was obviously directed against Pandit Jwaharlal Nehru) he was implicated in the case, Sardar Patel too could not go against him. You fight the case fearlessly. You will win." এক গোপন সাক্ষাৎকারে ডঃ আম্বেদকর এই কথাগুলি বলেছিলেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ও সম্পর্কস্থাপনের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র যে ভলান্টিয়ার্স ফোর্স সংগঠিত করেন তার সর্বাধিনায়ক রূপে অশ্বারূঢ় সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ভাবীকালের আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ককে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় ডাঃ হেডগেওয়ার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করে দেশের যুবসমাজকে সামরিকপ্রবণ করে তোলার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হওয়ার পিছনে সাভারকর ও হেডগেওয়ারের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত এই তিন মহানায়কের 'ট্রিলজি' প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক মঞ্চ একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

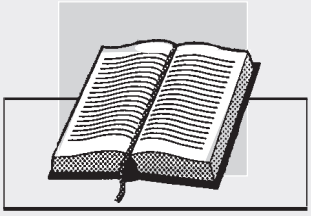

পুস্তক প্রসঙ্গ

বহু জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব আওড়ে দেশভাগের ওকালতি

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

সুনন্দ সান্যাল ও সৌম্য বসু লিখিত 'দি সিক্‌ল এন্ড দি ক্রিসেন্ট। কমুনিস্টস, মুসলিম লিগ এন্ড পার্টিসান' সাম্প্রতিক বাংলা গবেষণা ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন। গবেষকদ্বয় এপিলগ সহ দশটি অধ্যায়ে ভারতীয় কমুনিস্টদের দ্বিচারিতা বিশদভাবে দেখিয়েছেন। ভারতীয় কমুনিস্টদের দ্বিচারিতা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ধারণা আমাদের সকলের আছে। কিন্তু তাঁরা যে কী ভয়াবহ রকমের দ্বিচারী এই গ্রন্থটি না পড়লে হৃদয়ঙ্গম হবে না। বহু ভাষা-জাতি-ধর্ম— জনজাতি নিয়ে এই ভারত এক অখণ্ড দেশ। শুধু ভারতীয় ঐতিহাসিক কেন ভিনসেন্ট স্মিথের মতো সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ঐতিহাসিকরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন এই সত্য। কিন্তু কমুনিস্টরা ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার লক্ষ্যে বহুজাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন। এবং এই লক্ষ্যে থেকেই তাঁরা পাকিস্তান, গোর্খাল্যান্ড, ঝাড়খন্ড, দ্রাবিড়স্থান ইত্যাদি দাবি করেছেন। শুধু তাই নয়, এঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তিগুলিকে উস্কানি দিয়েছেন। যে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ বিব্রত তা এঁদের সৃষ্টি। পাকিস্তান দাবি নিয়ে এরা মুসলিম লিগের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সর্বতোভাবে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গা আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কম-বেশি আমরা সবাই জানি যে মুসলিম লিগ এই দাঙ্গা বাধিয়েছিল, কিন্তু আমরা একদমই জানি না যে সেদিন এই দাঙ্গায় মুসলিম লিগের পাশে এই কমুনিস্টরা পুরোমাত্রায় ছিল। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটন-এর ঘোষণার আগে মোটামুটি ভারত ভাগ হবে সঙ্গে বাংলাও ভাগ হবে ঠিক হয়ে গেছে। ১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গার জনক সুরাবরদি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন অখণ্ড বাংলা পাকিস্তানে যাক। বাংলা ভাগ হবে বুঝে তিনি নতুন চাল চাললেন। বাংলা যাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হয় এর জন্য আন্দোলন চালালেন। মজার ব্যাপার এই কাজে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী কমুনিস্টদের সঙ্গে পেলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল বাংলা ভাগ অবশ্যম্ভাবী তখন এঁরা বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলেন। এদের আকাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরও এঁরা শিশুরাষ্ট্র ভারতকে বিপাকে ফেলার উদ্দেশ্যে 'এই আজাদি ঝুটা হ্যায়' আওয়াজ তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন যাতে ভারতকে আবার খণ্ডিত করা যায়। গবেষকদ্বয় এই সঙ্গে দেখিয়েছেন যোগেন মণ্ডল তাঁর তপশীল সম্প্রদায়কে নিয়ে কমুনিস্ট ও মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ ভাগের কাজে মেতে উঠেছিলেন। যা তাঁদের পক্ষে হয়েছিল আত্মঘাতী। গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণায় অজস্র পত্রপত্রিকা ও গোয়েন্দা ফাইল ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। ফলে তাঁদের তথ্যউদঘাটন সম্বন্ধে কারও সংশয় হতে পারে না। শেষ কথা—গ্রন্থটি পুরোপুরি গবেষণাধর্মী অথচ ভাষা খুব সরল এবং প্রাঞ্জল, যা পাঠকদের বাড়তি আনন্দ দেয়। গ্রন্থটি অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।

সুনন্দ সান্যাল ও সৌম্য বসু। দি সিকল এণ্ড দি ক্রিসেন্ট। কমুনিস্টস, মুসলিম লিগ এন্ড পার্টিসান। কলকাতা : ফ্রন্টপেজ। মূল্য ৩৯৫। পৃষ্ঠা ১৯০।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়া

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নামাজ পড়তেন—বিষয়টি আমার জানা ছিল। তবে এ নিয়ে মুখ খুলতে চাইনি। বয়স আশি পেরিয়েছে। কবে কখন হঠাৎ টেঁসে যাব। তাই এবার মনে হলো, মুখ খোলা উচিত।

মহামানবদের জীবন কেন্দ্র করে বিশ্বের সর্বত্র মিথ গজিয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়াটাও একটা মিথ। এটা প্রমাণ করা খুবই সোজা। তবে নামাজ না পড়লেও শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মহামানব, এতে সংশয় বাতুলতা। আসলে মুসলিমরাও তাঁর অবারিত সান্নিধ্য লাভ করতেন। এটাই মিথের উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতেই পারেন।

মিথের খোসা ছাড়ানো যাক। 'হো আল্লা' বলে ইসলাম তথা আরবি ভাষায় কোনও কথাই নেই। কারণ কথাটি অর্থহীন। দ্বিতীয় শব্দটি হবে আল্লাহ্। আল্+লাহ্। আল্ আরবি আর্টিক্ল্। ইংরেজিতে যেমন দি/দা। লাহ্ অর্থ ইংরেজিতে গড।

আল্+লাহ্-এর সন্ধিকৃত রূপ বা ধ্বনি আল্লাহ্। দ্য গ্রেটেস্ট গড। তাছাড়া 'নামাজ করতে করতে' কেউ চেঁচিয়ে 'আল্লা' বলে না। নামাজে সবাইকে মসজিদে সমাগত হওয়ার জন্য উচ্চকণ্ঠে 'আজান' দেওয়া হয়। তখন এই ডাকের প্রথম বাক্য 'আল্লাহু আকবর'। আল্লাহ্ কেন, যেকোনও আরবি শব্দের শেষ বর্ণটি হলবর্ণ হলে উ সাফিক্স যুক্ত দেখলেই বুঝতে হবে, শব্দটি শেষ হয়নি। অমুসলিমরা লেখেন, 'আল্লাহো আকবর!' এটা অশুদ্ধ। কোনও নিরক্ষর মুসলিমও তা বলেন না। আল্লাহু আকবর অর্থ ইংরেজিতে 'দ্য গড ইজ গ্রেটেস্ট'। কবির-এর বহুবচন আকবর।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বসানো ('ওই সময়ে আল্লামন্ত্র জপ' ইত্যাদি) কথাগুলি একেবারে বানানো। কারণ অনেক। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি অমুসলিমের কাছে অতি জটিল। নামাজ পড়া আরও জটিল। ব্যায়াম করার মতো সিধে দাঁড়ানো, তারপর সামনে ঝুঁকে দুই হাঁটুতে দুই হাত রেখে কুঁজো হওয়া, তারপর আবার অ্যাটেনশন হয়েই সটান ঝুঁকে মেঝেয় কপাল এবং দুই হাত রাখা ইত্যাদি-প্রভৃতির সঙ্গে প্রতি পর্যায়ে আরবিতে মন্ত্রপাঠ করতে হয়। এইসঙ্গে আরও কিছু ক্রিয়াকর্ম আছে। অমুসলিমের পক্ষে এসব রপ্ত করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং তাঁকে এসব শিখতে হলে মসজিদে অন্যান্যদের পাশে দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রত্যহ পাঁচবার ('ত্রিসন্ধ্যা' নয়) দাঁড়ানো এবং পূর্বকথিত পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।

এইসব কারণেই 'দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে এক মস জিদে শ্রীরামকৃষ্ণ নামাজ পড়তে যেতেন' এই বাক্যটিও বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না। এর প্রামাণিক তথ্যাভিত্তি নেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীম এ বিষয়ে রামকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করেছেন, 'গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলাম', শ্রীম-এর এই বাক্যটিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার বলছি, ইসলামে 'আল্লামন্ত্র' বলে কিছু নেই। দীক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে অমুসলিমকে 'কলিমা শাহাদাত্' (শ্রেষ্ঠ আস্থাবাক্য) শেখানো হয়; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদার রসুলুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই। মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ)।' এই বাক্যটি মুখস্থ করা সময়সাপেক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ নামাজ না পড়লেও 'যত মত তত পথ' এই ধর্মের প্রবক্তা। তাই প্রকৃত মুসলিমের পক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে বাধা নেই।

(সৌজন্যে : আমার সময়)

সরকারি যাত্রামঞ্চ কি থিয়েটারের জন্য?

—শান্তিগোপাল

বিকাশ ভট্টাচার্য॥ যাত্রাজগতের কিংবদন্তী শিল্পী শান্তিগোপালের নামে একসময় গ্রামে-গঞ্জে, এমন কী শহরেও যাত্রার প্যান্ডেলে দর্শক উপচে পড়তো। কখনও সুভাষ, কখনও বিবেকানন্দ, আবার কখনও হিটলার, লেনিন বা কার্ল মার্কস—যে কোনও ভূমিকাতেই তাঁকে চমৎকার মানিয়ে যেত। যাত্রাজগতের সেই সুপারস্টার আজ বয়সের ভারে প্রায় গৃহবন্দী। কোনও অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষ দেখা যায় না। এমন কী বাৎসরিক সরকারি যাত্রা উৎসবেও তিনি নেই। শুধু কি বয়সের জন্য? না কি অভিমান! এক সময় শান্তিগোপালকে ভাঙিয়ে বামফ্রন্ট অনেক রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে। আজ আর তাঁকে প্রয়োজন নেই। তাই যে শিল্পী লেনিন বা মার্কস সেজে হাজার হাজার দর্শকদের সামনে মার্কসবাদ প্রচার করেছেন, তিনি আজ বামফ্রন্টের কাছে ব্রাত্য।

সম্প্রতি পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতীর নববর্ষ আবাহন ও সাংস্কৃতিক দেওয়াল পঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠানে তিনি দেওয়াল পঞ্জীর লোকার্পণ করেন। দেওয়াল পঞ্জীর এ বছরের থিম বাংলার যাত্রাপালা। যাত্রাপালা নিয়ে একটা সম্পূর্ণ বারো পৃষ্ঠার ক্যালেন্ডার! এই অভিনব আয়োজনে তিনি শরিক না হয়ে পারেননি। তবে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যাত্রাজগতের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে সি পি এমের বিমাতৃ- সুলভ আচরণে ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি একটা যাত্রা মঞ্চের জন্য জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেববাবুর কাছে দরবার করেছিলাম। বাংলার দিকে দিকে এই সরকার গ্রুপ থিয়েটারের জন্য বহু হল করে দিয়েছেন। নাটকের জন্য এক টাকা ট্যাক্স নেওয়া হয়। অথচ যাত্রার জন্য কোনও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নেই। অনেক আবেদন নিবেদনের পরে এই সেদিন ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের নামাঙ্কিত গিরিশ মঞ্চের পাশে একটা যাত্রামঞ্চ যাও বা হয়েছে—সেখানে যাত্রা হবে না থিয়েটার? যাত্রা বাংলার এক ঐতিহ্যশালী লোককথা। যাত্রাভিনয়ের এক বিশেষ আঙ্গিক আছে। মাঝখানে আসর চারিদিকে দর্শক। দর্শকদের মধ্য দিয়ে শিল্পী ছুটে গিয়ে অভিনয় করেন। কিন্তু সরকারি যাত্রামঞ্চের তিনদিক বন্ধ। থিয়েটার হলের মতো উইংস্—শুধু সামনেটা খোলা। সেখানে চেয়ারে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা। কোনও বিদেশী এসে যদি বাংলার ঐতিহ্যশালী যাত্রাপালার স্বাদ নিতে চায়—তা কি এই যাত্রামঞ্চে দেওয়া সম্ভব। শান্তিগোপাল আরও বলেন, আমি তাই ওই সরকারি যাত্রামঞ্চের উদ্‌ঘাটনের দিন যাইনি। আজও যাত্রা আকাদেমীর সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখি না।

জানা গেল এই অভিনব ক্যালেন্ডার পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সারা ভারতের ভারত সরকারের নয়টি জোনাল কালচারাল সেন্টারে পাঠানো হবে। আগ্রহীজন কলকাতার কেশব ভবনের বস্তু ভাণ্ডার থেকে এই দেওয়ালপঞ্জী সংগ্রহ করতে পারেন।

ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবির নাটক 'স্বাধীনতা'

মিতদ্রু দত্ত॥ তার কথা আমরা কেউ জানি না। তার খবর আমরা কেউ রাখিনি। সে চিরদিনই স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং দৃঢ়চরিত্র। বয়স মাত্র ২২। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করছে। ছাত্রাবস্থাতেই সামাজিক নানা বৈষম্য, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্যের মতো বিষয়গুলি তাকে গভীরভাবে দাগ কাটত। আমচমকা ঘটে গেল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়। শহুরে ছেলে সুজয় রায়। স্মার্ট বলিয়ে কইয়ে। বেশ কেতাদুরস্ত। পরিবারও অবস্থাপন্ন। অভাব কাকে বলে সে জানেই না। বড়লোক বাড়ি হওয়ার পাশাপাশি তার ছিল বড় একটা হৃদয়। যা সচরাচর অনেকের থাকেই না। সহপাঠীদের জন্য বইখাতা কিনে দেওয়া, অর্থ সাহায্য করা তার কাছে ছিল কর্তব্য। দুঃস্থ, অসহায় মানুষ তার কাছে সাহায্য চাইলে খালি হাতে ফিরত না। পকেটে যা থাকত তা-ই তুলে দিতে কার্পণ্য বোধ করত না সে। তবে তার এই সততা, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্পষ্ট কথাবার্তা পছন্দ হোত না অনেকেরই। কলেজে পড়াকালীন অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের একাংশের মধ্যে তাকে শেষ করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করল শাসক দলের মদতপুষ্ট কিছু কর্মচারী ও অধ্যাপক। নিঃশব্দে সে প্ল্যান চলে গেল সহপাঠীদের একাংশের মধ্যে, কারণটা কী? তার জনপ্রিয়তাই চক্ষুশূল হলো শাসক দলের কাছে। তারা মনে করতে শুরু করল যে সমাজসেবা করতে করতে সে হয়তো সক্রিয় রাজনীতিতেই জড়িয়ে পড়বে। তা কিন্তু আদৌ বাসনা ছিল না সুজয় রায়ের। সে তার মতোই থাকতে চেয়েছিল। সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল...। এই নিয়েই সংকল্প নাট্যগোষ্ঠীর নতুন নাটক 'স্বাধীনতা'। সুজয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিতাভ দেব। চমৎকার! এছাড়াও আছেন রাজা বসু, সুতনু দে, অমর মিত্র, সুভাষ দেবনাথ প্রমুখ নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আলোক সম্পাত সুভাষ দে। সংগীত রাজেশ ঘোষ।

সামগ্রিক পরিচালনা এবং রূপায়ণে শ্রীদেব ঘোষ সার্থক। বহুদিন পর এমন বাস্তব, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক উপহার পেলেন বাংলা থিয়েটারের দর্শকরা। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে কী বিভৎস! কী নিষ্ঠুর ব্যবহার তার সাথে। ভাড়া করা গুণ্ডারা কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তাকে অপহরণ করে খুন করে কলকাতা থেকে বহুদূরে। পুরশুড়ার প্রত্যন্ত নির্জন এলাকায়। এই নিয়ে ছাত্রসমাজে যথেষ্ট তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের তদন্ত বলে অন্য কেউ নয় শাসক দলের এক ছাত্রনেতাই এ কাজ করেছে। বিরোধী ছাত্র নেতারাও জড়িয়ে পড়েন প্রতিবাদ আন্দোলনে। অবশেষে কোর্টে মামলা হয় এবং দোষীরা গ্রেফতার হয়ে সোজা জেলে। কিন্তু তার পরিবারটি ছারখার হয়ে যায়। প্রথমে মা। তারপর তার বাবার হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়। উচ্চবিত্ত হলেও লোকবল না থাকায় সম্পত্তি বেদখল করে নিতে চায় প্রিয় প্রতিবেশীরা। আশ্চর্যের বিষয় এ সমাজে যারা সুজয়ের দ্বারা উপকৃত, যারা আর্থিক সাহায্য পেয়েছে তার থেকে, তারা পাশে দাঁড়ালেন না। তার কথা মনে রাখলেন না কেউ। এরপর এই শহরে এমন আর একটা ছেলেও কি হবে...?

শব্দরূপ-৫৮৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

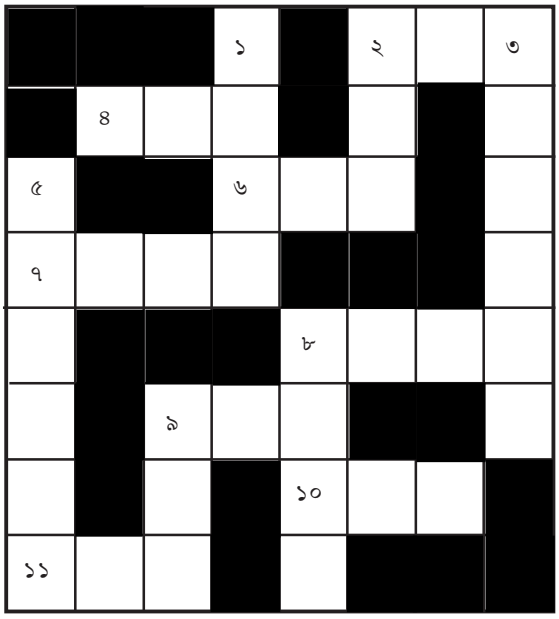

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. কৃষ্ণসহচর গোপবালক; শেষ দুয়ে মূল্য, **৪.** গৌরী, পার্বতী, **৬.** মন্দিরাদির শীর্ষদেশ, চূড়া, **৭.** গিরিমাটি, **৮.** ''ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই—'', **৯.** বেদনা (পদ্যে), **১০.** যুবনাশ্ব রাজার পুত্র, সূর্যবংশীয় রাজা, **১১.** শ্বেতহস্তী।

উপর-নীচ : ১. এই সদাচারী ব্রাহ্মণ শুদ্রানিতে আসক্ত হয়েও মৃত্যুকালে বিষ্ণুভক্ত হয়েছিলেন, দু'য়ে-চারে নকল, **২.** বিষ্ণু, **৩.** সংসারে অনাসক্তির ভান করে ভণ্ডামি; প্রথমার্ধে মাকড়সা, **৫.** নৃসিংহ কর্তৃক নিহত দৈত্যরাজ; প্রহ্লাদের পিতা, **৮.** কৃষ্ণ; শেষ দুয়ে মালাকার, **৯.** সঙ্গীতের মিশ্ররাগ বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮১

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অসীম বর্মন
বক্সীরহাট,
কোচবিহার

চা	র্বা	ক	■	চৈ	ত্র	র	থ
স	■	পি	হি	ত	■	■	■
■	শ	লা	■	ন	ন্দ	ঘো	ষ
■	ক্তি	■	■	■	■	ষ	■
■	শে	■	■	■	■	ব	■
জ	ল	পা	নি	■	স	তা	■
■	■	■	র	বা	ব	■	নী
জৃ	ম্ভ	কা	স্ত্র	■	রি	সা	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ জুন, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ৬

Swastika RNI No. 5257/57
30 May - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

গর্জে উঠুক বিপুল জনতা

কেউ কেউ বলছে যে এবার — 'এক জাতি এক প্রাণ' কেন হবে না? কেন হবে না Common Civil Code? কেন হবে না সকল ভারতবাসীর জন্য এক আইন? স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও যদি না হয় তাহলে যে মহাবিপদ সামনে এগিয়ে আসছে, আমরা তার থেকে মুক্ত হব কিভাবে? এই সমস্যার কথা — এবার বিপুল জনতার সামনে, প্রচারের মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব, ক্রমাগত — বছরের পর বছর। জনতা বিচার করবে, কী করা যায়। কেমন করে আন্দোলন করা যায়। এভাবেই একদিন ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে জনতার মাঝখান থেকে। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চাই (Common Civil Code চাই), সংখ্যালঘু তকমার বিলুপ্তি চাই। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক আইন চাই। এ লড়াই বিপুল জনতার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Forum of Nationalist Thinkers, প্রচারের কাজ শুরু করেছে। সকলের যোগদান আহ্বান করছে। সকলের সবরকম সাহায্য প্রার্থনা করছে। এ লড়াই আমাদের সকলের। হিন্দুস্থান অমর রহে। বন্দেমাতরম্।।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন

প্রধান নির্দেশিকা (ইস্যু) মাত্র দু'টি

এক - শাসকের সর্বস্তরে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

দুই - অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (Common Civil Code)

-- Courtsey --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS
12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069
Mob. : 9051498919 / 9433047202

দাম : ৫.০০ টাকা